POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

## আল্লাহ্‌র বাণী

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর।

(আল-বাকারা: ২৮৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 50

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13 ডিসেম্বর , 2018 5 রবিউস সানি 1439 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

## কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? বরং আল্লাহতালা তো কুরআন শরীফে বলিয়াছেন لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ 'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই'।

**আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়ে যে সকল লোকাদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, বরং তাহা ছিল হয় শাস্তি স্বরূপ ঃ অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে কতল করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল। অথবা সেই সকল যুদ্ধ ছিল আত্ম-রক্ষামূলক ঃ অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য। অথবা দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে ঃ যুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ (রা.) কোন যুদ্ধ করেন নাই।**

## 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আপনাদের আকীদা অনুযায়ী যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে আগমন করিবেন, অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষেকে বলপূর্বক মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? বরং আল্লাহতালা তো কুরআন শরীফে বলিয়াছেন لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ 'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই'।

(সূরা বাকারা ঃ ২৫৭ আয়াত) তাহা হইলে মসীহ ইবনে মরিয়মকে (আ.) বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এমনকি ইসলাম গ্রহণ অথবা কতল করা ব্যতীত 'জিযিয়া' (কর)ও তিনি গ্রহণ করিবেন না? কুরআন শরীফের কোন জায়গায়, কোন 'পারায়' এবং কোন 'সূরায়' এই শিক্ষা আছে?*

সমগ্র কুরআন বারবার বলিতেছে যে, ধর্মে বল প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়ে যে সকল লোকাদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, বরং তাহা ছিল ঃ

১. শাস্তি স্বরূপ ঃ অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে কতল করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল। যেমন আল্লাহতালা বলিতেছেন اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ঃ অর্থাৎ 'যে সকল মুসলমানের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা অত্যাচারিত হইবার দরুন তাহাদিগকে (কাফেরদের সহিত) মোকাবেলা করিবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং খোদাতালা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান' (২২ঃ৪০)।

২. অথবা সেই সকল যুদ্ধ ছিল আত্ম-রক্ষামূলক ঃ অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য।

৩. অথবা দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে ঃ যুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ (রা.) কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে যে, অন্য কোন জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা-মসীহ ও মাহদী সাহেব কিরূপ ব্যক্তি হইবেন যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, এমনকি কোন আহলে কিতাব (ঐশী গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি) হইতে জিযিয়া গ্রহণ করিবেন না এবং কুরআনের এই আয়াত - حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (অর্থাৎ (তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর) "যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়" ৯ঃ২৯- অনুবাদক) রহিত করিয়া দিবেন? তিনি ইসলাম ধর্মের কিরূপ পৃষ্ঠপোষক হইবেন যে, আসিয়াই তিনি কুরআনের ঐ সকল আয়াতও রহিত করিয়া দিবেন যেইগুলি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়েও রহিত হয় নাই এবং এতসব ওলট-পালট সত্ত্বেও আরবী এর (খতমে নবুয়তের) কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না?

এ পর্যন্ত নবুয়তের যুগের তেরশত বঙসর (বতুমানে চৌদ্দশত বৎসর-প্রকাশক) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে ইসলাম তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রকৃত মসীহর কাজ ইহাই হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করিবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ-নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভাঙ্গিয়া বেড়াইবার পরিবর্তে ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খৃষ্ট-ধর্মমতকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। যদি তোমরা **বল প্রয়োগ কর তাহা হইলে তোমাদের বল প্রয়োগ এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে, তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই।**

---

টিকা ১): * যদি বল যে, আরবদের জন্য বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার আদেশ ছিল, তাহা হইলে এই ধারণা কুরআন শরীফ হইতে কখনও প্রমাণিত হয় না, বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু সমস্ত আরবজাতি আঁ হযরত (সা.)-কে ভীষণ কষ্ট দিয়াছিল এবং অনেক পুরুষ ও স্ত্রী সাহাবীগণকে কতল করিয়াছিল এবং

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# তাহরীকে জাদীদে সারা ভারতের জামাতগুলির মধ্যে কাদিয়ান প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

## কাদিয়ানবাসীদেরকে অভিনন্দন!

এমনিতেই হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রত্যেকটি খুতবাই সমগ্র বিশ্বে পূর্ণ নিয়মিত মনোযোগ সহকারে শোনা হয়, কিন্তু তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের খুতবা শোনার উদ্দীপনা ও অনুভুতি অন্যান্য খুতবা শোনা থেকে ভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে। এর একাধিক কারণ আছে। যেমন- * হুযুর আনোয়ার (আই.) এই খুতবায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জামাতের আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনিয়ে থাকেন। * বিশ্বব্যাপী সারা বছরে আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর সামগ্রিক আদায়ের পরিমাণ ঘোষণা করেন। * প্রথম দশ স্থানাধিকারী দেশের নাম ঘোষণা করেন।* সর্বাধিক আর্থিক কুরবানী উপস্থাপনকারী প্রদেশ, জেলা বা অঞ্চলের নাম ঘোষণা করে থাকেন। * প্রথম দশ স্থানাধিকারী জামাতের নামও তিনি ঘোষণা করে থাকেন। * মাথাপিছু সর্বাধিক চাঁদা প্রদানকারী প্রথম দশটি দেশের নাম ঘোষণা করেন।* সমগ্র বিশ্বে তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী আহমদীদের সংখ্যা ঘোষণা করেন। * বিগত বছরের তুলনায় আর্থিক কুরবানীর এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে থাকেন। এই বিষয়গুলি তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের খুতবাগুলিকে অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক করে তোলে।

এবছর হুযুর আনোয়ার (আই.) ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, বেনিন, ভারত, তানজানিয়া, রাশিয়া, মালি, বুর্কিনাফাসো, জার্মানী, আইভোরী কোস্ট, ইন্ডোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, বারুন্ডী, কানাডা, কঙ্গো ব্রাজাভিল এবং পাকিস্তান থেকে আর্থিক কুরবানীসমূহের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে তাহরীকে জাদীদের ৮৫ তম বছরের ঘোষণা করেন এবং ৮৪তম বছরের অর্থাৎ ২০১৭ সালের সামগ্রিক আর্থিক কুরবানীর ঘোষণা দিয়ে বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা জামাতের নিষ্ঠাবান আহমদীদেরকে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক দান করেছেন। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য।

এবছর সর্বাধিক কুরবানী দানকারী দেশগুলির নাম হল যথাক্রমে ১) পাকিস্তান, ২) জার্মানী, ৩) যুক্তরাজ্য, ৪) যুক্তরাষ্ট্র, ৫) কানাডা, ৬) ভারত, ৭) অস্ট্রেলিয়া, ৮) মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ ৯) ইন্ডোনেশিয়া ১০) ঘানা, ১১) মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ।

ভারতে সর্বাধিক আর্থিক কুরবানী দানকারী দশটি রাজ্য হল যথাক্রমে- ১) কেরালা, ২) কর্ণাটক, ২) তামিল নাড়ু, ৪) তেলেঙ্গানা, ৫) জম্মু কাশ্মীর, ৬) উড়িশ্যা, ৭) পাঞ্জাব, ৮) পশ্চিমবঙ্গ, ৯) দিল্লী, ১০) মহারাষ্ট্র।

কুরবানীর দিক থেকে ভারতের প্রথম দশটি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে-পাঞ্জাবের কাদিয়ান,তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, কেরালার পাথা প্রিয়াম, চেন্নাই এর তামিলনাড়ু, কেরালার কালিকাট, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরু, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা, কেরালার পাঙ্গাড়ী, কেরালার কাননূর টাউন এবং কর্ণাটকের ইয়াদগীর।

মাথা পিছু আদায়ের দিক থেকে সুইজারল্যান্ড প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইডেন, বেলজিয়াম, জার্মানি, কানাডা এবং ফিনল্যান্ড।

এখানে বিশেষ করে একথাটি উল্লেখ করতে চাইব যে, ২০১৭ সালে সারা ভারতের জামাতগুলির মধ্যে সর্বাধিক চাঁদা দানকারী হিসেবে কাদিয়ান প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর জন্য যারপরনায় আনন্দিত। ২০১৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার বদরে তাহরীকে জাদীদ প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলাম যে, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জনপদ হওয়ার সুবাদে কাদিয়ানের উচিত অন্যান্য সমস্ত জামাতের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।" সেই বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে কাদিয়ানের স্থান ছিল পঞ্চম। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ান তৃতীয় স্থানে উঠে আসে যা নিশ্চয় প্রত্যেক কাদিয়ানবাসীকে উৎফুল্লিত করেছিল। ২০১৭ সালে কাদিয়ান ভারতব্যাপী জামাতগুলির মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করার পর আমরা মন-প্রাণ উজাড় করে পুনরায় আবেদন করেছিলাম যে, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জনপদ হওয়ার সুবাদে কাদিয়ানের উচিত ১ম স্থানে আসার চেষ্টা করা।' আল্লাহ্ এমনটিই করলেন, তিনি নিজ কৃপাগুণে কাদিয়ানকে ২০১৮ সালে প্রথম স্থানে উঠে আসার তৌফিক দান করেছেন। এর জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। হুযুর আনোয়ার অপ্রত্যাশিতভাবে যখন কাদিয়ানের নাম ঘোষণা করলেন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। কাদিয়ান কেবল দুই বছরের মধ্যে পাঁচ স্থান উপরে উঠে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে। এর জন্য সমস্ত কাদিয়ানবাসী সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য, বিশেষ করে সেই সমস্ত সদস্যরা যারা তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করেছেন আর সেই সমস্ত নিষ্ঠাবানও যারা এর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। কাদিয়ানবাসী এই সফলতার জন্য উচ্ছ্বসিত আর একটু কান পাতলে এই আনন্দের উচ্ছ্বাস সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে। এখন কাদিয়ানবাসীদের দায়িত্ব হল নিজেদের স্থান বজায় রাখা।

স্থান অনুসারে নিম্নে ভারতের জামাত ও রাজ্যগুলির ছয় বছরের সূচি দেওয়া হল যাতে জামাতের সদস্যরা এগুলি বিশ্লেষণ করে আর্থিক কুরবানীর দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের রাজ্য এবং নিজের নিজের জামাতগুলিকে প্রথম সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এর জন্য আপনাদেরকে নিজেদের চাঁদায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

প্রথম দশটি জামাতের স্থান-(ছয় বছরের পরিসংখ্যন)

| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৮ | কাদিয়ান | হায়দ্রাবাদ | পিথাপ্রেম | চেন্নাই | কালিকট | ব্যাঙ্গালোর | কোলকাতা | পিঙ্গাড়ী | কান্নুর | ইয়াদগীর |
| ২০১৭ | কালিকট | পিথাপুরম, | কাদিয়ান | হায়দ্রাবাদ | কেলকাতা | ব্যাঙ্গালোর | কান্নুর | পিঙ্গাড়ী | মাথোটম | কারোলাই |
| ২০১৬ | কারোলাই | কালিকট | হায়দ্রাবাদ | পিথপুরত | কাদিয়ান | কান্নুর | পিঙ্গাড়ী | দিল্লী | কোলকাতা | সাল্লুর |
| ২০১৫ | কারোলাই | হায়দ্রাবাদ | কালিকট | কাদিয়ান | পিথাপুম | কান্নুর | পিঙ্গড়ি | কোলকাতা | বেঙ্গালৌর | সোল্লুর |
| ২০১৪ | করোলাই | হায়দ্রাবাদ | কালিকট | কাদিয়ান | কান্নুর | পিঙ্গাড়ি | সোল্লোর | কোরকাতা | চেন্নাই | ব্যাঙ্গালোর |
| ২০১৩ | কারোলাই, | কালিকট | হায়দ্রাবাদ | কান্নুর | পিঙ্গাড়ী | কাদিয়ান | কোলকাতা | ইয়াদগীর | চেন্নাই | মাথোটম |

আমরা এখানে হায়দ্রাবাদের কথাও আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করব যারা গত বছর চতুর্থ স্থানে ছিল আর এবছর দ্বিতীয় স্থানে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হায়দ্রাবাদবাসীরাও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আরও কয়েকটি জামাতের কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে চেন্নাই ৯ম স্থানে ছিল। এরপর তিন বছর পর্যন্ত প্রথম দশে তাদের নাম চোখে পড়ত না। এবছর ২০১৮ সালে অকস্মাৎ চতুর্থ স্থানে উঠে আসা নিঃসন্দেহে সকলকে হতভম্ব করে দেওয়ার মত। এই দিকে চেন্নাই প্রশংসার পাত্র। ইয়াদগীর ২০১৩ সালে ৮ম স্থানে ছিল আর পরের চার বছর পর্যন্ত প্রথম দশে তাদের নামই ছিল না। এবছর ২০১৮ সালে তারা দূর দিগন্তে প্রথম রাত্রির চাঁদের মত উদিত হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

জামাতের পর এবার আমরা রাজ্যভিত্তিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কেরালা অত্যন্ত প্রতিকুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও নিজেদের প্রথম স্থান বজায় রেখেছে। অনেক আহমদী প্লাবনের কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন এবং তাদের ধন-সম্পদে আরও বেশি বরকত দিন। আমীন।

তামিল নাড়ু গত বছর ৫ম স্থানে ছিল। এবছর তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। এই কারণে তামিল নাড়ুও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। লক্ষ্য কররে দেখা যাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে তারা দ্বিতীয় স্থানে ছিল। পরে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে নেমে যায়। জম্মু কাশ্মীর যারা তৃতীয় স্থানে ছিল, এখন তারা পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। যেন এই দুটি রাজ্য পরস্পরের মধ্যে স্থান বিনিময় করেছে। কর্ণাটক যারা পূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকত, এখন গত তিন বছর থেকে ক্রমাগত নিজেদের দ্বিতীয় স্থান বজায় রেখে চলেছে।

এরপর ৮ পাতায় .....

# জুমআর খুতবা

**আঁ হযরত (সা.)-এর আরও ছয় জন সাহাবার সংক্ষিপ্ত জীবনীর আলোচনা। তাঁরা হলেন হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াকাস, হযরত কাতবা বিন আমের আনসারি, হযরত শুজা বিন ওয়াহাব, হযরত শামাস বিন উসমান, হযরত আবু আবাস বিন জাবার এবং হযরত আবু আকিল বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারি রিযওয়ানিল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। বাংলাদেশের মুরুব্বী সিলসিলা শ্রদ্ধেয় মৌলানা আব্দুল আযিয সাদিক সাহেবের মৃত্যু এবং নানকানা জেলার সৈয়্যদওয়ালা নিবাসী বাশারত আহমদ সাহেবের পুত্র সম্মানীয় মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ সাহেবের শাহাদত বরণ। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং নামাযা জানাযা গায়েব।**

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডে বাইতুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত ৩১ শে আগস্ট, ২০১৮, এর জুমআর খুতবা (৩১ জহুর, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূও (আই.) বলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী ছিলেন হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। তার পিতার নাম আবু ওয়াকাস মালিক বিন ওয়াহেব। বদরের যুদ্ধে ২য় হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের ছোট ভাই ছিলেন হযরত উমায়ের (রা.)। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের একজন ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল হামনা বিনতে সুফিয়ান। কুরাইশের বনু জহুরা গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন আর সেখানেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমায়ের (রা.) এবং হযরত উমার বিন মা'জ (রা.)-এর মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪) (আতাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, উমায়ের ইবনে ওয়াকাস)

কতকের মতে হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াকাস এবং হযরত খুবায়েব বিন আদির মাঝে মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। (উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২, বাব যিকরুল মোয়াখাত)

তার শাহাদতের ঘটনা এবং বদরের যুদ্ধে তার যোগদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নবীঈনে এভাবে লিখেছেন যে, মদীনার অনতিদূরে মহানবী (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীর শক্তি সামর্থ্যের ধারণা নেওয়ার জন্য যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। অল্পবয়স্ক বালকরা যারা রসূলুল্লাহ (সা.)এর সাহচর্য লাভের আকাঙ্খায় মদীনা থেকে বের হয়ে এসেছিল, তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াকাসের ছোট ভাই হযরত উমায়েরও স্বল্প বয়স্ক ছিলেন। স্বল্প বয়স্ক বালকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ যখন শুনতে পান তখন তিনি সৈন্যহিনীর মাঝে আত্মগোপন করেন। এক পর্যায়ে তার পালা যখন আসে তখন মহানবী (সা.) তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নির্দেশ শুনে হযরত উমায়ের কাঁদতে আরম্ভ করেন। রসূলে করীম (সা.) তাঁর এ অসাধারণ আগ্রহ দেখে পুনরায় তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৫৩)

ইতিহাসের আরেকটা বইতে তার উল্লেখ এভাবে দেখা যায় যে, উমার বিন সা'দ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে নিরীক্ষণ করেন তখন আমি আমার ভাই উমায়ের বিন ওয়াকাসকে দেখেছি যে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন, এতে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই! তোমার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) আমাকে দেখে ফেললে কম বয়স্ক মনে করে ফেরত পাঠাবেন। আমি যুদ্ধের জন্য যেতে চাই, হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শাহাদতের সম্মান দিবেন। সুতরাং মহানবী (সা.) এর সামনে যখন তাকে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি (সা.) তাকে ছোট মনে করে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন হযরত উমায়ের কাঁদতে আরম্ভ করেন। এতে মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। (আতাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, উমায়ের ইবনে ওয়াকাস)

তার তরবারী ছিল বড়। এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাতে তার তরবারীর খাপ বাঁধেন।

(আল আসাবা ফি তামিযীস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৩)

হযরত উমায়ের বিন আবি ওয়াকাস বদরের যুদ্ধে যখন শাহাদত বরণ করেন তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর।(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, উমায়ের ইবনে ওয়াকাস) ১৬ বছর বয়সেও তিনি এমন ছিলেন যখন তাকে ছোট দেখাত। মহানবী (সা.) সে সময় ছোটদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন না।

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ আজকে হবে, তিনি হলেন হযরত কাতবা বিন আমের (রা.)। তিনি একজন আনসারী ছিলেন এবং আমের বিন হাদিদার পুত্র ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খেলাফতকালে তার ইন্তেকাল হয়। তার মায়ের নাম হল জয়নব বিনতে আমর। তার স্ত্রীর নাম হযরত উম্মে আমর। তার ঘরে এক কন্যার জন্ম হয়, যার নাম হল হযরত উম্মে জামীল। উকবার প্রথম এবং দ্বিতীয় বয়আত অর্থাৎ উভয় বয়আতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি সেই ছয়জন আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা মক্কায় মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তার পূর্বে আনসারদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয় নি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪, কাতবা বিন আমের)

তিনি কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সেই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নবীঈনে লেখা হয়েছে যে, নবুওয়তের ১১ বছরে রযব মাসে মহানবী (সা.) এর মক্কায় ইয়াসরেব তথা মদীনাবাসীদের সাথে পুনরায় সাক্ষাত হয়ে যায়। তিনি (সা.) তাদের বংশ পরিচয় জানতে চান, এতে জানা গেল তারা খাজরাজ গোত্রের লোক আর মদীনা থেকে এসেছে। রসূলে করীম (সা.) পরম স্নেহ এবং ভালোবাসা আপ্লুত কণ্ঠে তাদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি আমার কিছু কথা শুনবেন? তারা উত্তর দেন যে, হ্যাঁ। আপনি কি বলতে চান বলুন। তিনি (সা.) বসে পড়েন আর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান এরপর কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে তাঁর পবিত্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এতে তারা পরস্পরের প্রতি তাকায় এবং বলেন যে, এটিই সুযোগ, কোথাও ইহুদী আমাদের চেয়ে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে না যায়।এই বলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ছিলেন ৬ জন, যাদের নাম হল আবু উমামা উসাদ বিন জারারাহ, যার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জারের সাথে আর সত্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন। আওফ বিন হারেস, তিনিও বনু নাজ্জারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর দাদা আব্দুল মোতালেবের নানাদের গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। রাফে বিন মালেক, যিনি বনু জুরিকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। সে সময় পর্যন্ত যতটা কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী (সা.) তখন সেই পুরোটাই তাকে দান করেন। কাতবা বিন আমের, যিনি বনি সালামার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর উকবা বিন আমের যিনি ছিলেন বনী হারামের

সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আরেকজন হলেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রেয়াব, যিনি ছিলেন বনু উবায়েদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এরপর তারা রসূলে করীম (সা.) এর কাছ থেকে বিদায় নেন আর যাওয়ার পথে অনুরোধ করেন যে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছে আর আমাদের ভিতর পরস্পর অনেক মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ইয়াসরেবে গিয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। আপনার (সা.) মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদের মধ্যে যদি পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন তবে তা বিচিত্র কিছুই নয়। এরপর আমরা সব দিক থেকে আপনার সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকব। সুতরাং তারা ফিরে যায় আর এভাবে তাদের মাধ্যমে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে কানাকানি আরম্ভ হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ,পৃ: ২২১-২২২)

মানুষ ইসলাম সম্পর্কে বলে যে, ইসলাম এসে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথচ ইসলামের কল্যাণে পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং নৈরাজ্য দূরীভুত হওয়ার সম্ভাবনার কথাই এরা উল্লেখ করেছেন আর বাস্তবে এটিই হয়েছে। পরস্পর যারা শত্রু ছিল তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। পূর্বের এক খুতবাতেও আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, তাদের পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাওয়া শত্রুর চোখে শূল হিসেবে বিঁধতো আর এ কারণে তাদের মাঝে আবার বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বুঝানোর কারণে আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে পুনরায় ভ্রাতৃত্ববোদের পরিবেশ তাদের মাঝে বহাল হয়।

রসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দক্ষ তীরন্দাজদের একজন ছিলেন হযরত কাতবা (রা.)। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অন্য সমস্ত যুদ্ধেই রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। ওহুদের যুদ্ধে পরম বীরত্বের সাথে তিনি যুদ্ধ করেন, সেদিন নয়টি আঘাত হানে তার দেহে। মক্কা বিজয়ের সময় বনু সালামার পতাকা তার হাতে ছিল। বদরের যুদ্ধে হযরত কাতবা কতটা দৃঢ়চিত্ত এবং অবিচল ছিলেন তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় । দু'টো সারির মাঝে তিনি একটি পাথর রাখেন আর বলেন, আমি ততক্ষণ এই ময়দান ছেড়ে পলায়ন করব না যতক্ষণ পর্যন্ত এ পাথর ময়দান থেকে বেরিয়ে না যায় অর্থাৎ শর্ত রাখেন যে, আমার প্রাণ গেলেও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি না।

ইয়াজিদ বিন আমের ছিলেন তার ভাই, যিনি সত্তর জন আনসারীর সাথে উকবার বয়আতের সময় উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইয়াজিদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন আর তার সন্তান-সন্ততি মদীনায় এবং বাগদাদেও ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪, কাতবা বিন আমের)

হযরত আবু হাতেমের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত কাতবা বিন আমের (রা.)-এর ইন্তেকাল হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে হয়েছে। আর ইবনে হাববানের মতে হযরত ওসমান (রা.) এর খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

(আল আসাবা ফি তামিযির সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮)

তৃতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত সুজা বিন ওয়াহাব (রা.)। যিনি ওয়াহাব বিন রাবিয়ার পুত্র ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তার ইন্তেকাল হয়। তাকে সুজা বিন আবি ওয়াহাবও বলা হয়। তার বংশ বনু আব্দুস সামসের মিত্র ছিল। তিনি দীর্ঘকায় এবং শীর্ণদেহ ও খুব ঘন চুল বিশিষ্ট ছিলেন। হযরত সুজা সেইসব পুণ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা অতি প্রারম্ভে মহানবীর ডাকে 'লাব্বায়েক' বলেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তির ছয় বছর পর রসূলে করীম (সা.) -এর নির্দেশে ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের দ্বিতীয় কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইথিওপিয়া হিজরত করেন। কিছুকাল পর এই সংবাদ শোনেন যে, মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে। এই সংবাদ শুনে হযরত সুজা (রা.) ইথিওপিয়া থেকে মক্কা ফিরে আসেন। কিছুদিন পর রসূলে করীম (সা.) সাহাবীদের মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলে তিনি তার ভাই উকবা বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কা ভূমিকে বিদায় বলে মদীনায় চলে যান। হুযূর (সা.) হযরত আওস বিন খাওলিকে হযরত সুজার ধর্মীয় ভাই বানান অর্থাৎ তাদের মাঝে ভ্রাতৃত স্থাপন করেছিলেন। হযরত সুজা (রা.) বদর, ওহুদ এবং পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ৪০ বছরের কিছু অধিক আয়ুষ্কাল পেয়ে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০, সুজা বিন ওয়াহাব)

হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সা.) পৃথিবীর অধিকাংশ বাদশাদেরকে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.),যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে, একদিন খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) মিম্বরে দণ্ডায়মান হন। আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের পর তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদের কতককে অনারব বাদশাহদের প্রতি প্রেরণ করতে চাই। আমার সাথে তোমরা মতবিরোধ করবে না, যেভাবে বনীইসরাইলীরা ঈসার সাথে করেছিল। এতে মুহাজেরগণ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কখনও আপনার সাথে কোন বিষয়ে মতভেদ করব না, আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করুন।

(সীরাত ইবনে কাসীর, পৃ: ৪২১, বাব যিকরু বায়াসাতে ইলা কাসরা) সুতরাং যেসব সাহাবী এই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মাঝে হযরত সুজা বিন ওয়াহাব (রা.)ও ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত সুজাকে হারেস বিন আবি শিমার গাস্‌সানির প্রতি দূত হিসেবে প্রেরণ করেন যিনি দামেস্কের কাছে গোতা নামক স্থানের রইস বা গভর্নর ছিলেন। অনেকের মতে তার নাম ছিল মুনযির বিন হারেস বিন আবি শিমার গাস্‌সানি। যাহোক, তিনি যে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন, তার প্রাথমিক বাক্য এমন ছিল 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম, মিন মুহাম্মাদির রাসূলিল্লাহে (সাল্লাল্লাহো আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইলাল হারেস ইবনে আবি শিমার, সালামুন আলা মানিত্তাবায়াল হুদা ওয়া আমানা বিল্লাহে ওয়া সাদ্দাকা ফা ইন্নি আদুউকা ইলা আন তু'মিনা বিল্লাহে ওয়াহদাহু লাশারিকালাহ ইয়াব্‌কা লাকা মুলকুকা।

(শারাহ যুরকানী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬, ১৯৯৬ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬, ১৯৯৬ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হারেস বিন আবি শিমারের প্রতি, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সত্যায়ন করে। এতে সন্দেহ নেই যে, আমি তোমাকে সেই খোদার প্রতি ঈমান আনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আর এভাবেই তোমার রাজত্ব টিকে থাকবে।

হযরত সুজা (রা.) বলেন, আমি পত্র নিয়ে যাত্রা করি আর হারেস বিন আবি শিমারের সিংহ দুয়ারে গিয়ে পৌঁছি।দুইতিন দিন কেটে যায়, কিন্তু দরবারে প্রবেশ করতে পারে নি। অবশেষে সেখানকার যে নিরাপত্তা প্রধান ছিল তাকে বলি, আমি মহানবী (সা.)এর পক্ষ থেকে দূত হিসেবে তার প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন সেই নিরাপত্তা প্রধান বলেন, গভর্নর অমুক দিন বাইরে আসবেন এর পূর্বে কোনভাবেই তুমি তার সাথে দেখা করতে পারবে না। হযরত সুজা বলেন, অতপর সেই নিরাপত্তাকর্মীই আমাকে মহানবী (সা.), তাঁর পবিত্র তবলীগ এবং মিশন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি বিশদভাবে তার সামনে ব্যাখ্যা করতে থাকি। এতে তার হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়ে এবং সে কাঁদতে আরম্ভ করে (অর্থাৎ সেই বাদশাহ গভর্ণরের যে নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিল তার কথা হচ্ছে) এরপর সে বলে যে, আমি ইঞ্জিলে এই নবীর লক্ষণাবলীই হুবহু পড়েছিলাম কিন্তু আমি ভাবতাম যে, তিনি সিরিয়াতে আবির্ভূত হবেন কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি কারিয অর্থাৎ ইয়ামেনের এলাকায় আবির্ভুত হয়ে গেছেন। যাহোক, আমি তার প্রতি ঈমান আনছি। অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রধান যিনি ছিলেন তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তাঁর সত্যায়ন করছি। আমার আশঙ্কা হয় যে, হারেস বিন আবি শিমার না কোথাও আমাকে হত্যা না করে ফেলে। তিনি একই সাথে এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেন যে, এতদঞ্চলের গভর্নর আমাকে হত্যা করবে। তিনি বলেন, এরপর সেই পাহারাদার আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা আরম্ভ করে এবং আমার সর্বোত্তম আতিথ্য করে। আর হারেস সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ আমাকে অবহিত করতে থাকে এবং তার বিষয়ে নৈরাশ্য ব্যক্ত করত। সে বলে, হারেস বিন আবি শিমার মূলত রোমের বাদশাহ কায়সারকে ভয় করে, কেননা তার রাজত্বেই সে এক শাসনকর্তা ছিল।অবশেষে একদিন হারেস বাইরে আসে আর দরবারে এসে আসন

গ্রহণ করে, তার মাথায় মুকুট ছিল। অতপর আমি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাই। তার সম্মুখে পৌঁছে আমি রসূলে করীম (সা.)-এর পত্র তার কাছে হস্তান্তর করি। পত্র পাঠ করার পর সে তা ছুড়ে ফেলে দেয় এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে থাকে, কে আছে যে, আমার কাছ থেকে আমার রাজত্ব ছিনতে পারে। সে ইয়ামেনে থাকলেও তার বিরুদ্ধে আমি অভিযান পরিচালনা করব, আমি তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সেখানে নিজেই পৌঁছব। সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ মহানবী যে পত্র লিখেছেন এবং তাকে যে সতর্ক করেছেন, যদি বিরত না হও তোমার রাজত্বের অবসান ঘটবে। এটি পড়ে সে রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে এই বাক্য উচ্চারণ করেন যে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হব। যাহোক, এরপর হারেস বিন আবি শিমার রাত পর্যন্ত দরবারেই উপবিষ্ট থাকেন আর মানুষ তার সামনে উপস্থাপিত হতে থাকে, এরপর তিনি অশ্বারোহীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন আর আমাকে বলেন তোমার মনিবের সামনে এখানকার পুরো চিত্র তুলে ধর। এরপর সে রোমের বাদশাহ অর্থাৎ কায়সারকে মহানবী (সা.)-এর পত্র সংক্রান্ত পুরো ঘটনা লিখে দূত পাঠায়। দূতের কাছে পুরো বিষয় লিখেন যে, এভাবে প্রতিনিধি আসে আমাকে ইসলামের তবলীগ করার জন্য। হারেস বিন আবি শিমারের এই পত্র কায়সারের কাছে তখন পৌঁছে যখন মহানবী (সা.)-এর আরেকটি পত্র হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে রোমের বাদশা কায়সারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। রোমের বাদশাহ হারেসের পাঠানো পত্র পাঠ করে তাকে এর উত্তরে লিখেন, এ নবীর ওপর হামলা এবং অভিযানের ধারণা পরিত্যাগ কর আর তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যাহোক, কায়সারের এই প্রত্যুত্তরমূলক পত্র যখন হারেসের কাছে পৌঁছে তখন তিনি হযরত সুজা (রা.) কে ডেকে বলেন, যিনি তখনও সেখানেই অবস্থান করছিলেন, তুমি কখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? এতে হযরত সুজা বলেন, আগামীকাল। বাদশাহ তখনই তাকে একশত মিসকাল স্বর্ণ প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর সেই নিরাপত্তা প্রধানও তার কাছে আসে এবং সে নিজেও কিছু টাকা এবং কাপড় দেয় আর বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার সালাম উপস্থাপন করবেন আর বলবেন যে, আমি তাঁর ধর্মের অনুসরণ করি। হযরত সুজা বলেন, মহানবী (সা.) এর সকাশে ফিরে আসার পর আমি মহানবী (সা.)কে হারিসের বাদশা সম্পর্কে সবকিছু অবগত করি। পুরো ঘটনা শুনে তিনি (সা.) বলেন, ধ্বংস হয়ে গেছে অর্থাৎ তার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর আমি মহানবী (সা.)-কে তার প্রাসাদের দারওয়ান মুররির পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাই আর সে যা কিছু বলেছিল তার সব কিছু মহানবী (সা.) কে বলি। এতে তিনি (সা.) বলেন, সে সত্য বলেছে। এই পুরো ঘটনা সীরাতুল হালবিয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন তা হল তিনি লিখেন, পঞ্চম তবলিগী পত্রের পত্র নম্বরের কথা হালবিয়াতে উল্লেখ নেই। তিনি বলেন পঞ্চম তবলিগী পত্র গাস্সানের বাদশাহ হারেস বিন আবি শিমারের নামে লেখা হয়েছে। গাস্সানের রাজত্ব আরবের সাথে সন্নিবেশিত এবং উত্তরে অবস্থিত ছিল আর এর গভর্নর কায়সার বা রোমের বাদশাহর অধিনস্ত ছিল। হযরত সুজা বিন ওয়াহাব যখন সেখানে পৌঁছেন তখন হারেস রোমের বাদশাহর বিজয় উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অর্থাৎ সেখানকার শাসনকর্তা রোম সম্রাটের বিজয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হারেসের সাথে সাক্ষাতের পর্বে সুজা বিন ওয়াহাব তার দারোয়ান অর্থাৎ ব্যবস্থাপকের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। হযরত সুজার কাছে মহানবীর কথা শুনে তাকে পূর্ণতঃ সত্য বলে গ্রহণ করেন। যাহোক, কয়েক দিন অপেক্ষার পর-সেই পুরো ঘটনা আবার বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সুজা বিন ওয়াহাব গাস্সানির রইসের দরবারে প্রবেশের অনুমতি পান। এরপর তিনি মহানবীর পত্র উপস্থাপন করেন। হারেস পত্র পাঠ করে তা ফেলে দেয় আর শুধু ক্রোধের সাথে ছুড়ে ফেলেই দেয় নি বরং যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরং সে সেনা পরিচালনারও সিদ্ধান্ত নেয় আর একই সময় রোমের বাদশাহকেও পত্র প্রেরণ করেন আর বলে যে, তাঁর বিরুদ্ধে আমি অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছি। এতে রোমের বাদশা বলেন, অভিযান বা সৈন্য পরিচালনার প্রয়োজন নেই বরং এই উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য এলিয়া বা বায়তুল মুকাদ্দসে এসে আমার সাথে দেখা কর। সেই শাসনকর্তাকে রোমের বাদশার সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ দেন। যাহোক, এ বিষয়ের এখানেই অবসান হয়। ইতিহাস এবং হাদীস থেকে জানা যায় যে, মদিনায় দীর্ঘ দিন এই ভীতি বিরাজমান ছিল যে, গাস্সানী গোত্রগুলো মুসলমানদের ওপর যেকোন সময় হামলা করতে পারে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৮২৮-৮২৯) আর এই ভীতি দীর্ঘদিন ছিল। সেই উত্তরের কারণে যা শিমার মহানবী (সা.)-এর সাহাবীর কাছে দিয়েছিল।

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূলে করীম (সা.) এই সংবাদ পান যে, বনু হাওয়াজানের একটি শাখা বনু আমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুযূর (সা.) হযরত সুজা বিন ওয়াহাবকে চব্বিশ জন মুজাহেদীনের নেতৃত্বে তাদের দমনের জন্য পাঠান যারা মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন বনু আমেরের যোদ্ধারা পাঁচ রাতের সফরের দূরত্বে অবিস্থত মক্কা এবং বসরার মধ্যবর্তী পারাসি নামে একটি স্থানে তাবু গেড়ে বসেছিল। তিনি অর্থাৎ হযরত সুজা মুজাহেদীনদের সাথে রাতে সফর করতেন আর দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতেন। হঠাৎ করে একদিন প্রভাতে বনু আমেরের লোকদের মাথার ওপর এসে উপস্থিত হন, তারা মুসলমানদেরকে হঠাৎ করে নিজেদের সামনে দেখে ভয় পেয়ে যায় অথচ তারা আক্রমণের জন্য পুরো প্রস্তুতি ও সৈন্যরাজী নিয়ে বেরিয়েছিল তারপরও সবকিছু ছেড়ে তারা পালিয়ে যায়। হযরত সুজা তার মুজাহেদীনদের নির্দেশ দেন যে, এদের পিছু ধাওয়ার প্রয়োজন নেই আর মালে গনিমত, সেই যুগের রীতি অনুসারে তারা যা কিছুই রেখে গিয়েছিল- উট এবং মেশপাল তা তারা মদীনায় নিয়ে আসেন। মালে গনিমত যে কত বেশি ছিল তার ধারণা এটি থেকেও পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মুজাহেদ ১৫ টি করে উট পেয়েছেন আর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম তো ছিলই। অর্থাৎ তারা আক্রমণের পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল আর সকল যুদ্ধ সাজ সরঞ্জামে তারা সজ্জিত ছিল।

এরপর যেই সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল হযরত শামাস বিন উসমান। পূর্বের এক খুতবায় তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এসেছিল। তার পিতা ছিলেন হযরত উসমান বিন শারিদ। তৃতীয় হিজরীতে ওহুদের যুদ্ধের সময় তার ইন্তেকাল হয়। তার নাম হল উসমান এবং উপাধি ছিল শামাস। এই উপাধিতে তিনি পরিচিত ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল বনু মাখযুমের সাথে আর ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-২৩৯৪)ইবনে হিসাম হযরত শামাস বিন উসমানের নাম শামাস কেন পড়েছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, শামাস (রা.) এর নাম হল উসমান। আর শামাস আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হল খ্রিষ্টানদের এক ধর্মীয় নেতাকে শামাস বলা হতো, যে অজ্ঞতার যুগে মক্কায় আসে, সে খুবই সুদর্শন ছিল, খ্রিষ্টান নেতার সৌন্দর্য দেখে মক্কার মানুষ আশ্চাযার্ন্বিত হয়। উতবা বিন রাবিয়া যে উসমানের মামু ছিলেন তিনি বলেন, আমি শামাসের চেয়ে বেশি সুন্দর ছেলে তোমাদের দেখাব। এরপর তার ভাগ্নে হযরত উসমানকে তিনি দেখান, এরপর থেকে লোকেরা উসমানকে শামাস বলা আরম্ভ করে। হযরত শামাসের নাম শামাস নামকরণের আরেকটি কারণ এটিও বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তার চেহারায় লাল আভা এবং শুভ্রতা, যেন তিনি সূর্যের মত ছিলেন। এই কারণে শামাস নাম তার আসল নামের ওপর প্রাধান্য পায়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬২)

হযরত শামাস বিন উসমান এবং তার মা হযরত সাফিয়া বিনতে রাবিয়া বিন আবদে শামাস ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত শামাসের মা শায়েবা এবং উতবা এই দুই নেতা যারা বদরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল তাদের বোন ছিলেন। হযরত শামাস বিন উসমান ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসার পর মদীনার দিকে হিজরত করেন। হযরত শামাস বিন উসমান মদীনায় হিজরতের পর হযরত মুবাশ্বের বিন আবদে মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। সাঈদ বিন মুসায়েদ বলেন, হযরত শামাস বিন উসমান ওহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পূর্বে মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত শামাস

বিন উসমান এবং হযরত হানজালা বিন আবি আমেরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত শামাসের ছেলের নাম ছিল হযরত আব্দুল্লাহ আর তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে হাবীব বিনতে সাঈদ, তিনি প্রাথমিক যুগে হিজরতকারী মুসলমান নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৪) (সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৪) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩০)

হযরত শামাস বিন উসমান ওহুদ এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি শামাস বিন উসমানকে ঢাল সদৃশ্য পেয়েছি। রসূলে করীম (সা.) ডান, বাম যেদিকেই দৃষ্টিপাত করতেন সেখানেই হযরত শামাসকে দেখতেন যে, তিনি তার তরবারির মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলেন ওহুদের যুদ্ধে, যতক্ষণ না পাথরের আঘাতে মহানবী (সা.) চেতনা হারিয়ে ফেলেন। হযরত শামাস মহানবী (সা.) এর সামনে ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। যার ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এ অবস্থায় তাকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়, তখনও তার দেহে কিছুটা প্রাণ ছিল। প্রথমে তাকে হযরত আয়েশার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন হযরত উম্মে সালমা বলেন, আমাকে ছেড়ে আমার চাচাত ভাইকে কি অন্য কারো ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে? এতে মহানবী (সা.) বলেন, তাকে হযরত উম্মে সালমার কাছেই নিয়ে যাও, তারপর তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আর তার ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ওহুদের যুদ্ধে গুরতর আহত হন আর অবস্থায় তাকে এখানে আনা হয় আসেন। এরপর রসূলে করীম (সা.) এর নির্দেশে হযরত শামাসকে ওহুদে নিয়ে গিয়ে তার পরিহিত পোশাকেই দাফন করা হয়। তাকে মদীনায় আনার পর অর্থাৎ যুদ্ধের পর যখন আহত অবস্থায় তাকে মদীনায় আনা হয় তখন সেখানে তিনি একদিন এক রাত জীবিত ছিলেন আর বলা হয়ে থাকে যে, একান্ত দুর্বলতা আর অচেতন থাকার কারণে তিনি কিছু পানাহার করেন নি। হযরত শামাস (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছে ৩৪ বছর বয়সে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩১)

আরেক সাহাবী হলেন হযরত আবু আবস বিন জাবর। তার পিতার নাম ছিল জাবর বিন আমর। তার মৃত্যু ৩৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়স হয়েছে। তার আসল নাম ছিল আবদুর রহমান আর ডাক নাম ছিল আবু আব্স। আনসারের বনু হারসা গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। অজ্ঞতার যুগে তার নাম ছিল আব্দুল উজযা। রসূলে করীম (সা.) এই নাম পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখেছেন। উজযা ছিল এক প্রতিমার নাম, এর পরিবর্তে আব্দুর রহমান রেখেছেন। মহানবী (সা.) এর সাথে তিনি বদরসহ সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। ইহুদী কাব বিন আশরাফকে যে সমস্ত সাহাবীরা হত্যা করেছিলেন তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রসূলে করীম (সা.) হযরত আবু আব্স এবং হযরত উনায়েসের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ৩৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়। মক্কায় তার সন্তান-সন্ততিদের অনেকেই বসবাস করত। হযরত উসমান তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তিনি কবরস্থ হন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২২) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৩) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫)

হযরত আবু আব্স বিন জাবর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তিনি আরবী লিখতে জানতেন। অথচ সে যুগে আরবে লেখার প্রচলন খুবই সামান্য ছিল। হযরত আবু আবস এবং হযরত উতবা বিন নিয়ার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাদের উভয়ই বনু হারেসার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। হযরত উমর এবং হযরত উসমান তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে সদকা সংগ্রহের জন্য পাঠাতেন অর্থাৎ তারা অর্থ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৮)

মহানবীর যুগে হযরত আবু আবাসের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাকে একটি লাঠি দিতে গিয়ে বলেন, এই লাঠি থেকে আলো নাও। সেই লাঠি তার সামনের পথকে আলোকিত করতো।

( আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২২)

এর একটি অর্থ এটি হতে পারে, এই লাঠি তোমার হাতে থাকবে, যেভাবে অন্ধ মানুষ হাঁটার সময় লাঠি ব্যবহার করে, এটি সেভাবে কাজে আসবে কিন্তু একটি অর্থ এটিও হতে পারে যে, হয়তো এটি থেকে আলো বের হত। তিনি কম দেখতেন, অনেক সময় রাতের বেলা লাঠি থেকে হয়তো আলো বের হতো। অন্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে এই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, অনেক সময় অন্ধকারে তারা সফর করতেন আর তাদের লাঠি থেকে আলো বের হত।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৯৩)

একটি বর্ণনা অনুসারে একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিনজন সাহাবী রাতের বেলা সফর করছিলেন আর অন্ধকার রাত ছিল, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা একইভাবে এই দৃশ্য দেখিয়েছেন যে, আলো তাদের সম্মুখের পথ আলোকিত করতে থাকে। (সংগৃহীত)

হযরত আবু আবসের পুত্র একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আবস মহানবী (সা.)-এর পিছনে নামায পড়তেন এরপর তাদের গোত্র বনু হারসায় ফিরে যেতেন। একবার এক অন্ধকার রাতে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তিনি তার ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন আর তার লাঠি থেকে আলো বের হওয়া আরম্ভ হয়, যার ফলে পথ আলোকিত হয়ে যায়।

(আল মুসতাদরক আলাস সালেহীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০২৮)

হযরত উসমান (রা.) তার অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যান, তখন তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন, তার চেতনা যখন ফিরে পান তখন হযরত ওসমান (রা.) তাকে বলেন, আপনি আপনার অবস্থাকে কেমন মনে করছেন? তিনি বলেন, আমি আমার অবস্থাকে ভালো দেখছি কিন্তু উট বাঁধার একটি রশি সম্পর্কে আমি অস্বস্তিতে আছি, যা ভুলবশত আমার এবং কর্মীদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত আমি সেই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারছি না।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৮)

এমনই ছিল তার বৈশিষ্ট্য, যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি যে, যাকাত বা কর সংগ্রহের দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত ছিলেন আর এ কাজে বিভিন্ন স্থানে তাকে পাঠানো হত। দায়িত্ববোধ এবং বিশ্বস্ততার মান দেখুন, একটি উট বাঁধার রশি ভুলবশতঃ হারিয়ে যায় আর সে কারণে জীবনের শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত ব্যকুল ও অস্বস্তিতে ছিলেন। মৃত্যু ব্যধিতে আক্রান্ত, এরপরও মনে পড়ে যে, এই রশি কোথাও পরকালে না আমাদের পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। তো এরা এমন মানুষ ছিলেন যারা খোদা ভীতি, সততা এবং বিশ্বস্ততার এই মানে উপনীত ছিলেন।

হযরত আনাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এর চেয়ে আগে আসরের নামায আর কেউ পড়তো না অর্থাৎ সময়ের নিরীখে। আসরের প্রথম সময় তিনি আসরের নামায পড়তেন। আনসারের দুই ব্যক্তি এমন ছিলেন যাদের ঘর ছিল মসজিদে নববী থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। একজন ছিলেন হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনজির, যিনি বনু আওফের সাথে সম্পর্ক রাখতেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু আবাস বিন জাবার, যার সম্পর্ক ছিল বনু হারসার সাথে। আবু লুবাবার ঘর ছিল কুবায় আর হযরত আবু আবসের ঘর ছিল বনু হারেসায়। উভয় সাহাবী অনেক দূরে থাকতেন, দুই আড়াই মাইল দূরে,তাদের উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করতেন আর নিজেদের পাড়ায় যখন ফিরে যেতেন তখনও তাদের পাড়ায় আসরের নামায পড়া হত না।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৭)

এত দ্রুত তারা পথ চলতেন এবং এতটা দূরত্ব অতিক্রম করে মহানবীর পিছনে নামায পড়ার জন্য তারা আসতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবসের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খোদার পথে নিজের পাগুলো ধূলামলিন করে, খোদা তার জন্য জাহান্নাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৯)

অর্থাৎ খোদার পথে জিহাদকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে জীবনযাপনকারী, খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে যারা কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়, তরা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে তবলীগের উদ্দেশ্য যারা সফর করে আর তারাও যারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নামাযের জন্য আসে এদের সকলেই এদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তাদের জন্য অগ্নি হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

আরেক সাহাবী ছিলেন হযরত আবু আকিল বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.)। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ বিন সায়ালবিয়া। দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে তার ইন্তেকাল হয়। তার নাম ছিল আব্দুর রহমান ইরাসি বিন আব্দুল্লাহ। তার পুরোনো নাম হলো আব্দুল উজ্জা, ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তার নাম রেখেছেন আব্দুর রহমান। তার সম্পর্ক বাল্লি গোত্রের শাখ বনু উনায়েফের সাথে। তিনি আনসারের বনু জাজবা বিন কুলফার মিত্র ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু আকিল আর এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলেন। ১২ হিজরীতে আবু বকরের খেলাফতকালেই ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮-২৪৯)

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন, তখন একদিন এক যুবক মহানবী (সা.) এর সামনে উপস্থিত হন। এরপর ঈমান গ্রহণের পাশাপাশি মহানবী (সা.) এর পবিত্র হাতে বয়আতের সম্মানে সম্মানিত হন এবং প্রতিমার প্রতি তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? তিনি নিবেদন করেন আমার নাম আব্দুল উজ্জা। এতে মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং আজ থেকে তোমার নাম হবে আব্দুর রহমান। মহানবী (সা.) এর নির্দেশ তিনি শিরোধার্য করেন আর সবাইকে বলে দেন যে, এখন আমি আব্দুল উজ্জা নই বরং আব্দুর রহমান। তার পিতৃ-পুরুষের একজন ছিলেন ইরাশা বিন আমের। তার সম্পর্ক ধরে তাকে ইরাশিও বলা হয়।

(আসমানী হিদায়াত কে সত্তর সিতারে, প্রণেতা তালিব হাশমি,পৃ: ৪৯১-৪৯২)

তিনি সেই সব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা মহানবী (সা.) -এর আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ শুনে সারারাত কাজ করে যা কিছু উপার্জন করতেন তা আর্থিক কুরবানী হিসেবে দিয়ে দিতেন। বুখারী শরীফে তার সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হযরত আবু মাসউদ বর্ণনা করেন, সদকা খয়রাতের বা আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ যখন আমাদেরকে দেওয়া হয় তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মুটের কাজ করতাম। হযরত আবু আকিল পারিশ্রমিক হিসেবে যে খেজুর পেয়েছেন তা থেকে আর্ধেক 'সা' (এক 'সা' প্রায় এক কেজি) খেজুর নিয়ে আসেন, আরেক ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি নিয়ে আসেন। এতে মুনাফেক বলা আরম্ভ করে, আল্লাহর এ ব্যক্তির সদকার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে খয়রাত করেছে তা কেবল দেখানোর জন্য। তখন এই আয়াত নাযেল হয় যে,

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔ (التوبۃ:79)

অর্থাৎ এরা মুনাফেক, যারা মু'মিনদের মাঝে যারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতামূলকভাবে সদকা খায়রাত করে, আর্থিক কুরবানি করে, তাদের হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে আর তাদেরকেও যারা কায়িক শ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছে অন্তর্ভুক্ত রাখে না, আর্থিক কুরবানী করা সত্ত্বেও মুনাফেকরা হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে আল্লাহ্ তাদের মাঝে চরম বিরোধীদেরকে হাসিঠাট্টার শাস্তি দিবেন এবং তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সম্মুখিন হবে। (সূরা তওবা, আয়াত: ৭৯) (সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর)

খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের অদ্ভুত সব দৃশ্য তাদের মাঝে দেখা যায়। খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তারা আশ্চর্যজনকভাবে চেষ্টা করতেন। তাদের এসব আদর্শকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে খোদা তা'লা পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের নসিহত করেছেন।

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এভাবে বর্ণনা করেন, তাকে অর্থাৎ হযরত আবু আকিলকে 'সাহেবুস সা'-ও বলা হয়। ঘটনা হল হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ তার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আসেন, আনসারদের মধ্য থেকে এক দরিদ্র ব্যক্তি আবু আকিল এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি সারা রাত দুই 'সা' খেজুরের বিনিময় কূপ থেকে পানি উঠাতে থাকি, এর এক সা' আমি ঘরের লোকদের জন্য রাখি আর দ্বিতীয় 'সা' আপনার সামনে উপস্থাপন করছি। কোন কোন রেওয়ায়েতে এক 'সা' থেকে অর্ধেক 'সা' দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ অর্ধেক দিয়ে দিলাম আর অর্ধেক ঘরে রেখে আসলাম। মুনাফেকরা তখন বলে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আবু আকিলের সা'র মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ্ তা'লা তখন বলেন "আল্লাযিনা ইয়ালমিযুনাল মুতইনাল মু'মিনীনা ফিস সাদাকাতে ওয়াল্লাযিনা লা ইয়াযদুনা ইল্লা যহুদাহুম"

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৩৩)

অর্থাৎ এরা মুনাফেক, যারা মু'মিনদের মাঝে যারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করে তাদের হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে, তাদেরকেও নিজেও যারা নিজেদের পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কিছু খরচ করার শক্তি রাখে না। তিনি সেই আনসারী সাহাবী ছিলেন, যিনি মুসায়লাবা কাযযাবের উপর শেষ হামলা করেছিলেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, ইয়ামামার দিন মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত আবু আকিল উনেফি আহত হন, তার কাঁধ এবং বক্ষের মাঝে তীর লেগেছিল, যা লেগে বাঁকা হয়ে যায়, তিনি আহত হন, এরপর সেই তীর বের করা হয়। এই তীর লাগার কারণে তার শরীরের বাম দিকটা দুর্বল হয়ে যায়। এটি প্রথম দিনের কথা, এরপর তাকে উঠিয়ে তার তাঁবুতে আনা হয়। ভয়াবহ যুদ্ধ যখন চলতে থাকে আর মুসলমানরা পরাজিত হয়, মুসলমানরা এক পর্যায়ে পিছু হটে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছনে চলে যায়, সে সময় হযরত আবু আকিল আহত ছিলেন। তিনি হযরত মা'ন বিন আদির আওয়াজ শুনতে পান যে, তিনি আনসারদেরকে গগন বিদারী কণ্ঠে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন আর বলছিলেন আল্লাহর উপর ভরসা কর, আল্লাহর ওপর ভরসা কর এবং নিজ শত্রুর ওপর পুনরায় হামলা কর আর হযরত মা'ন মানুষের সামনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এটি তখনকার কথা যখন আনসাররা বলছিল যে, আমরা অর্থাৎ আনসারদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দাও। সুতরাং একেকজন আনসার একদিকে সমবেত হতে থাকে, উদ্দেশ্য ছিল এরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে আর বীরত্বের সাথে এগিয়ে যাবে এবং শত্রুর উপর হামলা করবে আর এতে সব মুসলমানদের মাঝে দৃঢ়তা ফিরে আসবে আর মনবল দৃঢ় হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেন, এরপর হযরত আবু আকিল আনসারীদের কাছে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান, যদিও আহত অবস্থায় ছিলেন, মারাত্মকভাবে দুর্বলতাও ছিল কিন্তু দাঁড়িয়ে যান। আমি বললাম, হে আবু আকিল! আপনি কি চান? আপনার মাঝে যুদ্ধ করার শক্তিই তো নেই। তিনি বলেন, এই আহবানকারী আমার নাম নিয়ে ডেকেছেন, আমি বললাম, তিনি তো আনসারদেরকে ডাকছেন, আহতদের নয়। তিনি তাদেরকে ডাকছেন, যারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখে। হযরত আবু আকিল বলেন, তিনি আনসারদের ডেকেছেন, তাই আমি আহত হলেও আমি যেহেতু আনসারদের অন্তর্ভুক্ত, তাই হামাগুড়ি দিয় যেতে হলেও তার ডাকে অবশ্যই আমি সাড়া দিব। হযরত ইবনে ওমর বলেন, হযরত আবু আকিল তার কোমর বেঁধে নেন আর তার ডান হাতে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে ঘোষণা করা আরম্ভ করেন, হে আনসার! হুনায়নের যুদ্ধের ন্যায় শত্রুর উপর আবার হামলা কর। সুতরাং আনসাররা সমবেত হোন, (আল্লাহ্ তাদের প্রতি কৃপা করুন) এরপর মুসলমানরা বড় বীরত্বের সাথে শত্রুর দিকে এগিয়ে যান এমনকি শত্রুকে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে বাগানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। মুসলমান এবং শত্রু পরস্পর ঝাপিয়ে পড়ে আর আমাদের ও তাদের মাঝে তরবারি চলা আরম্ভ হয়। হযরত ইবনে ওমর বলেন, আমি হযরত আবু আকিলকে দেখেছি, তার আহত হাত কাঁধ থেকে কেটে মাটিতে পড়েছিল, তার শরীরে চৌদ্দটি আঘাত ছিল, যেসবের প্রত্যেকটি প্রাণান্তকর ছিল। আল্লাহর শত্রু মুসায়লেমা নিহত হয়ে সেখানেই পড়েছিল। হযরত আবু আকিল মাটিতে আহত পড়েছিলেন, তার শেষ নিঃশ্বাস ছিল, আমি অবনত হয়ে তাকে বলি, হে আবু আকিল! তিনি বলেন, লাব্বায়েক, আমি উপস্থিত আর প্রকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কে বিজয় কে লাভ করেছে? আমি বললাম, আপনাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছে আর আমি গগণ বিদারী কণ্ঠে বলি আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা কায্যাব ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর তিনি খোদার প্রশংসার গান গাইতে গিয়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন। হযরত ইবনে উমর বলেন, মদীনা ফিরে আসার পর আমি হযরত উমরকে তার পুরো অবদানের কথা শোনালাম। হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্ তা'র প্রতি কৃপা করুন। তিনি সব সময়

শাহাদতের দোয়া করতেন আর আমি যতটা জানি, তিনি আমাদের মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর এই কথাগুলি বলেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯) ( হায়াতুস সাহাবা, সংকলক- মহম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০০-৮০১) আল্লাহ তা'লা সকল সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের মুরব্বী সিলসিলাহ শ্রদ্ধেয় মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের, যিনি ২০১৮ সনের ২৬ জুলাই ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ৪র্থ শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থাতেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কাদিয়ান চলে যান। সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের সাহচর্যে তার বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়। ভারত বিভাগের পর বিদেশী ছাত্রদের সেখান থেকে স্ব-স্বদেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি বাংলাদেশ ফিরে আসেন। কিন্তু কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। পুনরায় বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে তিনি কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন, সফরকালে হিন্দু এবং শিখেরা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে,একজন মুসলমান যুবক এমন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ট্রেনে কীভাবে একা নির্ভিকভাবে সফর করছে। যাহোক, দিল্লি পৌঁছার পর সেখানকার জামা'ত একটি ফ্লাইটে তাকে লাহোর পাঠানোর ব্যবস্থা করে, তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অবিভক্ত ছিল, তিনি নিরাপদে সেখানে পৌঁছে যান। জামেয়ার ছয় বছরের পড়ালেখা সেখানে সম্পূর্ণ করেন, এরপর জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের আরো তিন বছরের কোর্স করে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর পাঞ্জাব এবং পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল ডিগ্রীও অর্জন করেন। এরপর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের জামা'ত সমন্দুরীতে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৬৩-৬৪ সনে তাকে পূর্ব পাকিস্তানে বদলি করা হয়। বিভিন্ন জামা'তে সেখানে কাজ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কুরআনের বাংলা অনুবাদের জন্য একটা বোর্ড গঠন করেন তখন কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেবের সুপারিশে মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের নামও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে মুজাফ্ফর উদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব এবং মৌলভী মোহাম্মদ আমীর বাঙ্গালী সাহেবও তার সাথে কাজ করতেন আর অনুবাদের কাজের জন্য রাবওয়ায় অবস্থান করেন। এরপর মোহাম্মদ আমীর সাহেবের ঢাকায় স্থানান্তর এবং চৌধুরী মুজাফ্ফর উদ্দিন বাঙ্গালী সাহেবের ইন্তেকালের পর এই কাজের জন্য ১৯৭৯ সনে তাকে ঢাকা পাঠানো হয়। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ইন্তেকালের পর তিনি একা এই কাজ অব্যাহত রাখেন, অবশেষে শতবার্ষিকী জুবিলীর বছর কুরআনের বাংলা অনুবাদ ছাপার কাজ সমাপ্ত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। তালীম তরবিয়ত এবং তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। বেশ কয়েকবার বিরোধীদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হোন। আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হওয়ার বা কারাজীবনের সম্মানও তিনি লাভ করেন। ১৯৯২ সনে যখন ঢাকা বকশী বাজার স্থিত জামা'তের কেন্দ্রে শত্রুরা হামলা করে তখন বড় বীরত্বের সাথে একাই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, এরফলে তার মাথাসহ সারা দেহে বেশ কয়েকটি আঘাত আসে।

শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা দুই পুত্র, বেশ কিছু পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী তিনি রেখে গেছেন। তার তিন কন্যা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, ছেলেদের একজন আমেরিকায় আর ছোট ছেলে হাবীবুল্লাহ সাদেক সাহেব যুক্তরাজ্যে রয়েছেন আর এম.টি.এ-এর নিউজ বিভাগে কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তান-সন্ততিদের তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল পাকিস্তানের নানকানা জেলার সাঈদওয়ালার অধিবাসী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ সাহেব শহীদের। তার পিতার নাম হল মুকার্‌রম বিশারাত আহমদ সাহেব। ২৯ আগস্ট নানকানা জেলায় মাগরিবের সময় তার দোকানে ডাকাতরা হামলা করে আর তাদের গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্ল াহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী, ছয় জন ডাকাত অত্যাধুনিক অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার দোকানে মোটরসাইকেলে করে আসে। তার জুয়েলারীর দোকান ছিল, দোকানে প্রবেশ করে লুটপাট করে এরপর বাইরের দিকেও প্রবল গোলাগুলি করতে থাকে। যার ফলে এক পথিকও নিহত। লুটপাট করে এরা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তারা জাফরুল্লাহ সাহেবকে লক্ষ্য করে তিনবার গুলি করে, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। জাফরুল্লাহ সাহেবের দোকানে তিনি ব্যতীত আরো মানুষ ছিল কিন্তু তারা শুধু জাফরুল্লাহ সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি করে অর্থাৎ এ ব্যক্তি আহমদী একে লক্ষ্য বানাও,কোন অসুবিধা নেই, দ্বিগুণ পুণ্যের ভাগী হবে। মরহুম খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং অতিথি পরায়ণ ছিলেন। এই কারণেই তার ইন্তেকালের পর বহু সংখ্যক মানুষ সমবেদনা জানাতে আসে, যাদের একটি বড় সংখ্যা ছিল গয়ের আহমদী। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, প্রতিটি আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলতেন, রীতিমত নামায পড়তেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসীও ছিলেন। মরহুম একজন সাহসী এবং নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। মরহুম মৃত্যুর পূর্বে সাঈদওয়ালার সেক্রেটারী তালিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার বয়স ছিল ৩০ বছর। আড়াই বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়েছিল, তার এক দেড় বছরের পুত্র সন্তান আছে, যার নাম মুহাম্মদ তালহা। মরহুম শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতা ছাড়া এক ভাই এবং পাঁচ বোন রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য এবং মনোবল দিন আর তার পুণ্যকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

*****❖*****❖*****❖*****

২য় পাতার শেষাংশ.....

পরিশেষে জমাত আহমদীয়া ভারতের সমস্ত সদস্যদের নিকট আবেদন করব যে, নতুন ওয়াদাগুলি যেন গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে লেখানো হয়। যে যত বেশি ওয়াদা লেখাবে, নিঃসন্দেহে সে ততটাই বেশি পুণ্যের ভাগীদার হবে। নিষ্ঠাপূর্ণ ত্যাগকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো বিনষ্ট করেন না। তিনি এর প্রতিদান ইহজগতেও দান দিয়ে থাকেন আর পরকালে প্রতিদান এটি থেকে পৃথক। হুযুর আনোয়ার (আই.) মাথাপিছু সর্বাধিক চাঁদাদানকারী যে সমস্ত দেশগুলির নাম উল্লেখ করেছেন তাতে ভারতের কোন উল্লেখ নেই। এর অর্থ হল এখনও বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। ভারতের নাম দশটি সর্বাধিক হারে চাঁদা দানকারী দেশের তালিকায় আসা উচিত। এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা সত্যিকার অর্থে উল্লেখযোগ্যহারে চাঁদা বৃদ্ধি করব।

আমাদের এনিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত যে, বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতের যে কয়েক বছর যাবৎ একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, তাই আমাদরেকে নিজেদের চাঁদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই স্থানকে উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমরা এমনটি করতে পারি, কেবল মনোযোগ ও ইচ্ছাশক্তির অভাব রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দেশকে, যেটি মসীহ মওউদ (আ.)-এর জন্মভূমি, কুরবানী এবং উন্নতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানে দাঁড় করানোর তৌফিক দান করুন। আমীন (মনসূর আহমদ মসরূর)

**********

## জলসা সালানার চাঁদা

কাদিয়ান জলসা সালানার আর মাত্র কয়েকটি দিন অবশিষ্ট রয়েছে। জলসার জন্য যে সমস্ত অতিথিবর্গ কাদিয়ান আসেন তারা সকলেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি হিসেবে গণ্য হন যাদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা মরকযের দায়িত্ব। অতএব সমগ্র জামাতের উচিত এই পুণ্যের ভাগী হওয়া।

যেরূপ জামাতের সদস্যবর্গ অবগত আছেন, জলসা সালানার চাঁদা আবশ্যিক চাঁদার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারীদেরও অনেক সময় এই চাঁদা বাকি থেকে যায়। অতএব এখনও যারা চলতি বছরের জলসা সালানার চাঁদা দেন নি তারা যথাশীঘ্র স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী মালের কাছে এই চাঁদা দিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন এবং জামাতের সদস্যদের ধন-সম্পদে বরকত প্রদান করুন। আমীন।

(নাযির বায়তুল মাল, কাদিয়ান)

# হুদায়বিয়ার সন্ধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

**ভাষণ-জলসা সালনা কাদিয়ান, ২০১৩** **বক্তা:মাননীয় মহম্মদ হামীদ কওসর**

যেরূপ আপনারা শুনলেন যে, আমার বক্তব্যের বিষয় হল আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনী হুদাই বিয়ার সন্ধির আলোকে। 'সীরত' আরবী শব্দ যা সারা, ইয়াসীর, সীরান থেকে উদ্ভুত এবং এর অর্থ হল, যে ব্যক্তির জীবনী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তার অপরাপরদের সহিত আচরণ, তার স্বতন্ত্র কর্মধারা এবং জীবন পদ্ধতি। সুতরাং এই অর্থের আলোকে বক্তব্যের বিষয় এই দাঁড়াল আঁ হযরত (সাঃ) এর সেই আচরণবিধি ও পবিত্র জীবনাদর্শ বর্ণনা করা যা তিনি চন্দ্র বর্ষ হিসাবে ১৪২৯ সনে হুদাইবিয়ার স্থানে অবলম্বন করেছিলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবর্গ,একটি অনুমান অনুসারে ৬১০ খ্রীঃ -এর ২০শে আগস্ট মক্কার'হেরা' গুহায় কোরআন মজীদের অবতরণের ধারা সূচিত হয়েছিল। এর সঙ্গেই দ্বীনে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। এতে অংশ গ্রহণ কারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামের এই অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে বিরোধীতা ও যাতনা দেওয়ার প্রক্রিয়া ভয়ঙ্কর রূপ নিতে থাকে । মুসলমানরা দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী শক্তিতে প্রাণবন্ত ছিল । এই শক্তির উপর ভর করে একদা হযরত আব্দুর রহমান বিন ওউফ (রাঃ) বাহুবলে মোকাবেলা কারর অনুমতি প্রার্থনা করেন। এর উত্তরে সৈয়্যদনা হযরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন, " ইন্নি উমিরতু বিল আফুয়ে ফালা তুক্বাতিলু" আমাকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে তোমাকে আমি লড়াই করার অনুমতি দিতে পারি না । যখন ইসলামের সূচনার তের বছর অতিবাহিত হচ্ছিল মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছে যায় মুসলমানদের মক্কাতে বাস করা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আঁ হযরত (সাঃ) এবং মুসলমানরা নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন । এবং সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রীঃ মক্কা ছেড়ে ৩০০ মাইল দূরে মদিনার দিকে চলে যান । মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময়ে আঁ হযরত (সাঃ) মক্কার দিকে শেষ বারের মত দৃষ্টিপাত করেন। আর বেদনাপূর্ণ শব্দে বলেন হে মক্কার বস্তি তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থানের চাইতে প্রিয়, কিন্তু তোমার বাসিন্দারা আমাকে এখানে থাকতে দেয় না। মুসলমানেরা অসহায় হয়ে মক্কা ত্যাগ করেন কিন্তু তাদের মন- ও মস্তিস্ক থেকে পবিত্র মক্কার স্মৃতি একমুহূর্তের জন্যও মুছে যায় নি। তারা দিবা রাত্রি উম্মুলকুরা (জনপদসমূহে র জননী) ও বালাদুল আমীন (শান্তির শহর) কে স্মরণ করতে থাকত। সৈয়দেনা বেলাল বিন রাব্বাহ (রাঃ) শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মক্কার গলিতে টেনে নিয়ে বেড়ানো হয়েছে। কিন্তু মক্কাকে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করে কবিতা পড়তেন যার অর্থ - 'আর কখনও কি সেইদিন গুলি পুনরায় ফিরে আসবে যখন পবিত্র মক্কার উপত্যকায় রাত যাপন করবো।'

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবর্গ হযরত বেলাল (রাঃ) এর মক্কা ত্যাগের বিরহ বেদনাকে তিনি কবিতার ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

পংক্তি গুলি পড়ে হযরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেবার (রাঃ) ঐ পংক্তি গুলি স্মরণে এল যা তিনি কাদিয়ান দারুল আমান ত্যাগ করার সময় কাদিয়ানে বসবাস রত দরবেশগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

'তোমরা সৌভাগ্যবান যে কাদিয়ানে বসবাস কর। শেষ যুগের মেহেদীর গৃহে বসবাস কর। মসীহর পদযুগল যাকে সম্মানীয় করে তুলেছে। তোমরা সেই অলৌকিক নিদর্শন ভূমিতে বসবাস কর।'

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবর্গ! সাহাবাগণ বাহ্যত মদিনায় থাকলেও মক্কা তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক জুড়ে ছিল। দিবারাত্রি মক্কা জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করতেন। মক্কা ফেরার অপেক্ষায় ছয় বৎসর অতিক্রম হয়ে গেল। ঐ সময়ই আঁ হযরত (সাঃ) দিব্য দর্শনে দেখেন যে তিনি সাহাবাদের সঙ্গে বায়তুল্লাহর তোয়াফ করছেন। সুতরাং তিনি (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের করেন যে উমরার জন্য রওনার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি করার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে তিনিও এও বললেন, এই সফরে কোন যুদ্ধ নেই। এই কারণে সঙ্গে অস্ত্র নিওনা। তবে আরবের প্রথানুযায়ী নিজেদের খাপে তরবারী সঙ্গে রেখ।

এই নির্দেশ অনুযায়ী আঁ হযরত (সাঃ) চোদ্দোশো সাহাবীর সঙ্গে জুল কায়াদা,৬ হিজরী মার্চ ৬২৮ সনে সোমবার সকালে মদিনা থেকে মক্কার জন্য রওনা হন। অপরদিকে কুফ্ফার কুরায়েশ যখন এই সংবাদ পায় তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ ও উমরা করা থেকে বাধা দিতে যথা সম্ভব প্রস্তুতি নিল। এদিকে হুজুর (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছালেন যেটা মক্কা থেকে মাত্র নয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল,আঁ হযরত (সাঃ) এর উটনী যার নাম 'আল কুসওয়া' ছিল, সহসা মাটিতে বসে পড়ল। এবং চেষ্টা সত্ত্বেও উঠার জন্য প্রস্তুত হল না। সাহাবা (রাঃ) বললেন যে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) বললেন না, না,এ ক্লান্ত হয় নি বরং যে আল্লাহ্ আসহাবে ফিলদের (হাতি আরোহীদের) হাতি কে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিলেন, তিনিই এই উটকেও বাধা দিয়েছেন। তাই খোদার কসম মক্কার কুরায়েশ সুলাহ্ করার জন্য যা কিছু দাবী করবে আমি তা স্বীকার করব। এর পর তিনি তাঁর উটকে পুনরায় ওঠার জন্য ডাকলেন, আল্লাহর মহিমা (কুদরত) যে এবার সে তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেল। তখন তিনি (সাঃ) এই উটনীকে হুদাইবিয়ার উপত্যকার অপরদিকে নিয়ে গেলেন। এবং সেখানে এক প্রস্রবণের কাছে দাঁড়িয়ে উট থেকে নিচে নেমে এলেন এবং সেখানেই তাঁর আদেশ মত সাহাবারা তাঁবু খাঁটালেন। বেশি সময় অতিক্রম হয়নি, ঠিক তখন সাহাবারা বললেন যে প্রস্রবণ শুকিয়ে গেছে। মানুষ এবং পশু উভয়েই খুব কষ্টে আছে। তাই কী করণীয়। হুজুর (সাঃ) একটি তীর নিয়ে আদেশ করলেন যে, সেটা প্রস্রবণের মাঝে পুঁতে দেওয়া হোক। এবং তিনি (সাঃ) নিজে প্রস্রবণের কাছে আসলেন এবং কিছুটা পানি মুখে দিলেন তারপর আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে করতে সেই পানিটা প্রস্রবণের মাঝে মুখ থেকে ফেলে দিলেন এবং সাহাবাদের বললেন এখন কিছু সময় অপেক্ষা কর। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে সেই প্রস্রবণের মধ্যে এত পানি ভরে উঠল যে সকলেই তার দ্বারা নিজের নিজের প্রয়োজন মেটালেন এবং পানির কষ্ট দূরীভূত হল। এর উপর আল্লাহ্ তা'লা আরও কৃপা করলেন যে, সেই রাত্রেই সেখানে বৃষ্টি হল। যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) এবং তার সাহাবারা উমরা করতে এসেছিলেন তারা কোন প্রকার দ্বন্দ বা লড়াই চাইছিলেন না। সুতরাং হুজুর (সাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) কে মক্কা গিয়ে কুরায়েশদেরকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং উমরার ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত করতে আদেশ করলেন। এবং তিনি (সাঃ) হযরত উসমানকে একটি লিখিত পত্র দেন যা কুরায়েশদের সর্দারদের নামে ছিল। এই পত্রে আঁ হযরত (সাঃ) তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং কুরায়েশদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, আমাদের নিয়ত ছিল উমরা করার এবং আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে উমরা করার পর প্রত্যাগমন করব। মক্কা পৌছে হযরত উসমান (রাঃ) আঁ হযরত (সাঃ) এর লেখাটি

## ১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

একটা সাধারণ সমাবেশে উপস্থাপন করলেন।এই একনিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি সত্বেও কুরায়েশ সর্দাররা এই জেদের উপর অটল থাকে যে মুসলমানরা এবছর কোন ক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রাঃ) হতাশ হয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি করতে লাগলেন। সেই আসরে মক্কার দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের মনে মন্দ অভিপ্রায় জেগে উঠল,হয়তো একথা ভেবেই যে, এভাবে আমরা চুক্তিতে বেশি লাভাদায়ক শর্তাবলী অর্জন করতে পারব। তারা হযরত উসমান (রাঃ) কে আটক করে রাখল। এবং গুজব ছড়ানো হল যে হযরত উসমান(রাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদ যখন হুদায়বিয়ায় অবস্থানরত আঁ হযরত (সাঃ) এর কাছে পৌঁছাল তিনি মুসলমানদেরকে একটি বাবলা গাছের নিচে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন :-"যদি এই সংবাদ সত্যি হয় তবে খোদার কসম এই স্থান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যতক্ষণ হযরত উসমান (রাঃ) এর প্রতিশোধ না নিই।তার পর আঁ হযরত (সাঃ) সাহাবা (রাঃ) দের কে বললেন, এস । আমার হাতে হাত রেখে ইসলামে বয়াত গ্রহণের পদ্ধতিতে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পশ্চাদপদ হবে না এবং প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না। এই ঘোষণায় সমস্ত সাহাবারা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। সাহাবাদের সংখ্যা ১৪০০ কিম্বা ১৫০০ ছিল। এদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রিয় প্রভুর হাতে যেন দ্বিতীয় বারের জন্য বিক্রি হয়ে গেল। যখন বয়াত গ্রহণ হচ্ছিল হুজুর (সাঃ) তাঁর বাম হাত নিজের ডান হাতের উপর রেখে বললেন এটা উসমানের হাত। কেননা যদি তিনি এখানে থাকতেন তবে এই পবিত্র সওদা বাজিতে তিনি কারোর থেকে পিছু থাকতেন না।" এই বয়াত গ্রহণকে "বয়াতে রিজওয়ান " বলা হয়। এই বয়াত সম্পর্কে কুরান মজীদে উল্লেখ রয়েছে :-অথাৎ " যারা তোমার হাতে বয়াত করে তারা নিশ্চয় আল্লাহর বয়াত করে। নিশ্চয় আল্লাহ মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার বয়াত করেছিল"। (সূরা ফাতাহ্ আয়াত-১১) যখন এই বয়াত গ্রহণের সংবাদ কুফ্ফারে মক্কার কাছে পৌঁছায় তারা ভীত হল। এই বয়াতের সংবাদ তাদের মনে এক ভীতির সঞ্চার করে। তারা হযরত মোহম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামকে বিজয়ের সন্নিকটে আসতে অনুভব করতে লাগল। তারা তৎক্ষনাৎ হযরত উসমান (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিল। এবং তাদের প্রতিনিধিদের হুজুর (সাঃ) এর কাছে কঠোর নির্দেশ দিয়ে পাঠাল যে, যেমন করেই হোক মহম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হও। যেন আমাদের ও কিছু সম্মান বজায় থাকে। তবে এই শর্ত অবশ্যই রাখবে যে, মুসলমানরা এখন উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যেন না আসে। তারা যেন মদিনায় ফিরে যায় এবং আগামী বৎসর উমরার জন্য আসে। অপরদিকে আঁ হযরত (সাঃ) প্রথম থেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলেন যে, আমি এই সময় এমন কোন কথা বলব না যা খানা কাবা এবং হারাম এর সম্মানের পরিপন্থী। সুতরাং এমনই এক আপোসপূর্ণ পরিবেশে সোহেল বিন উমর কুফ্ফার মক্কার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে হুজুর (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হল।

'সোহেল' শব্দ সরলতা থেকে এসেছে। এই কারণে হুজুর (সাঃ) ঐ ব্যক্তির নামের শুভ নিদর্শন গণ্য করে সাহেল বিন উমর কে দেখে বললেন, এখন চুক্তি সহজতর প্রতীত হচ্ছে। সোহেল আসল এবং আসতেই হুজুর (সাঃ) কে বললেন, আসুন চুক্তি পত্র লিখুন। যা শুনে হুজুর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে ডেকে পাঠালেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন যে, লেখ- বিস্মিল্লাহের রহ্মানের রহিম। সোহেল এর উপর আপত্তি তোলে। আমরা রহ্মানকে চিনি না। এটা না লেখা হোক। বরং আরবের রীতি অনুযায়ী "হে আল্লাহ তোমার নামের সহিত" লেখা হোক। অপরদিকে মুসলমানদেরও জাতিগত সম্মান এবং ধর্মীয় গরিমা প্রকট হয়ে উঠল। তারা এই পরিবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তারা জোর দিচ্ছিলেন যে, এটা-ই লেখা হোক। এর উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন যেমনটি সোহেল বলে, তেমনই লেখা হোক। সুতরাং বিস্মিল্লাহ লেখা হল। এর পর নবী করীম (সাঃ) বললেন যে, এটা ঐ চুক্তি, যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) করেছেন। প্রত্তুত্তরে সোহেল আপত্তি করে যে, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসুল বলে মনে করি না। সমস্ত ঝগড়া তো এই বিষয়ের উপরই। এজন্য আমরা মহম্মদ রসুলুল্লাহ লেখার বিষয়ে ঐক্যমত নই। বরং এটা লেখা হোক মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ চুক্তি করল। নবী করীম (সাঃ) বললেন আপনারা মানুন বা না মানুন আমি মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহও বটে। এটাই লেখা হোক। কিন্তু সেই সময় হযরত আলী (রাঃ) মহম্মদ রসুলুল্লাহ লিখে ফেলেছিলেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, মহম্মদ রসুলুল্লাহ শব্দটি কেটে দাও।

হযরত আলি আত্মসম্ভ্রম বোধ ও উত্তেজনা প্রকাশ করে বললেন 'রসুলুল্লাহ' শব্দ আমি নিজের হাতে মিটাবার দুঃসাহস করতে পারি না। প্রত্যুত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন তুমি না মিটালে আমি নিজেই মিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং 'রসুলুল্লাহ' শব্দটি মিটিয়ে দিয়ে সেই স্থানে আব্দুল্লাহ্ লিখে দিলেন। এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন চুক্তি এই যে, মক্কাবাসী আমাদেরকে তোয়াফ করতে বাধা দেবে না। সোহেল পুনরায় আপত্তি করে বলে খোদার কসম এবছর তো আমরা অপনাদেরকে উমরা করতে দেব না। কেননা এতে আরবদের কাছে আমাদের নাক কাটা যাবে। হ্যাঁ আগামী বছর আপনারা উমরা করতে পারেন। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন আচ্ছা এমনটাই লেখ।

এই চুক্তির পাঁচটি শর্তাবলী ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি শর্ত হল-১। আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং পরের বছর মক্কায় এসে কুরবানী সহ উমরা করতে পারবেন। কিন্তু নিয়ামের ভিতরের তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। এবং মক্কাতে তারা তিন দিনের বেশি সময় অবস্থান করবেন না।সোহেল একটি শর্ত লিখিয়েছিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি মক্কা থেকে মদিনা চলে যায় যদিও সে মুসলমানও হয় আঁ হযরত (সাঃ) যেন তাকে মদিনায় আশ্রয় না দেয় এবং তাকে ফিরিয়ে দিবে। এই শর্তের প্রকৃত শব্দগুলি ছিল। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদিনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসতে চায় তবে মক্কাবাসী তাকে মদিনায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। এই চুক্তি দশ বছরের জন্য হবে। এবং এই ব্যবধানে মুসলমান এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি থাকবে।যখন এই চুক্তি লেখা হচ্ছিল সোহেল বিন উমর যিনি কুরায়েশ মক্কার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে চুক্তি লেখাচ্ছিলেন। তার যুবক পুত্র আবুজিন্দল, যে মক্কায় মুসলমান হয়ে গেছিল এবং তার ইসলাম গ্রহণের কারণে ফুরাতের সর্দাররা তাকে বন্দি করে রেখেছিল কোন রূপে আঁ হযরত (সাঃ) এর কাছে পৌঁছে যায়। এবং বেদনা দায়ক কণ্ঠে ডেকে বলে হে মুসলমানেরা আমাকে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যাতনা দেওয়া হচ্ছে। খোদার দোহাই আমাকে রক্ষা কর। মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সোহেল বললেন, এই শর্ত চুক্তিতে লেখা হয়ে গেছে। এই জন্য আবুজিন্দালকে আমাদের হাতে তুলে দিন। যদি আপনি আবুজিন্দালকে না ফিরিয়ে দেন, তবে বুঝব যে চুক্তি এখানেই শেষ হয়ে গেল। আঁ হযরত (সাঃ) সোহেলকে বললেনঃ- দয়া ও মানবতার খাতিরেই জিন্দলকে আমাদের দিয়ে দাও। কিন্তু সোহেল কোন কথা শুনল না। এবং হযরত (সাঃ) আবু জিন্দলকে বড় বেদনা ও আকুলতার সহিত বললেন- হে আবু জিন্দল। ধৈর্য ধারণ কর। খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। আল্লাহ্ তোমার জন্য এবং তোমার অপরাপর দূর্বল মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কোন পথ করে দেবেন। কিন্তু এখন আমরা নিরুপায়। কেননা মক্কাবাসীদের সঙ্গে চুক্তি করার কথা হয়ে গেছে। এবং আমরা এর বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ করতে পারি না।এই চুক্তি মুসলমানদের ইচ্ছা ও আশানুরূপ ছিল না এই কারণে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল। তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই অপ্রত্যাশিত ও একতরফা চুক্তিকে মানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল না। প্রারম্ভিক কিছু মুহূর্ত এমন টানাপোড়েনে অতিক্রান্ত হল। সোহেলের যাওয়ার পর আঁ হযরত (সাঃ) মুসলমানদেরকে নিজের নিজের কুরবানী জবাহ করতে আদেশ করলেন, তৎসঙ্গে মাথার চুল নাড়া করে ফেলতে এবং মদিনা ফিরে যওয়ার জন্য প্রস্তুতি করতে। এটা প্রথম এবং শেষ বার ছিল যখন সাহাবারা এই আদেশ পালন করতে করতে কয়েক মুহূর্তের বিলম্ব করে ফেললেন। আঁ হযরত (সাঃ) মর্মাহত হলেন। তিনি নিঃশব্দে নিজের তাঁবুতে প্রস্থান করলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মুল মুমেনিন উম্মে সালমা (রাঃ) যিনি সফরের সঙ্গী ছিলেন, যখন তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন একজন বুদ্ধিমতি জীবনসঙ্গীর ভূমিকা পালন করলেন এবং

শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়....

অপরদিকে উম্মুল মুমেনিনদের আধ্যাত্মিক মা হওয়ার ভূমিকা পালন করলেন। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক মা অত্যন্ত সৃজনশীলতার সঙ্গে হুজুর (সাঃ) এর নিকট বললেন যে, হে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার সাহাবারা অবাধ্য নয়। কিন্তু এই চুক্তির শর্তাবলী তাদেরকে দুঃখ-বেদনায় পাগল করে দিয়েছে। আমার পরামর্শ এই যে,আপনি বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী জবাহ্ করুন এবং নিজের মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন। তারপর দেখুন এই সাহাবারা কিভাবে আপনার অনুসরণ করে। আঁ হযরত (সাঃ) এর এই পরামর্শ পছন্দ হল। এবং বাইরে এসে কোন কথা না বলে তাঁর কুরবানীর পশুকে জবেহ করে নিজের মাথার চুল কামাতে শুরু করে দিলেন। সাহাবারা এই দৃশ্য দেখে নিজেরাও নিজেদের কুরবানীর পশু জবেহ করে দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামাতে শুরু করলেন। আঁ হযরত (সাঃ) হুদাইবিয়ায় প্রায় ২০ দিন অবস্থান করেছিলেন। এরপর তিনি মদিনায় ফেরার জন্য আদেশ করলেন যখন আঁ হযরত (সাঃ) ওসমানের নিকট কারাযাল জমিন এ পৌঁছান সাহাবাদেরকে তিনি (সাঃ) বলেন, আজ রাত্রে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা ফাতাহ্,আয়ত ২-৪)

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ্ তোমার (প্রতি অরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি তোমাকে ক্ষমা করে দেন। তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেন, তোমাকে সরলসুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এবং আল্লাহ্ যেন তোমাকে সম্মান জনক বিজয় দানকারী সাহায্যে ভূষিত করেন"।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! এই সময় যখন কিছু সংখ্যক মুসলমান হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের পরাজয় মনে করছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত মুসলমান যারা দুরদর্শী ছিলেন না, তারা একথা বলল এটা আবার কেমন বিজয় যে, আমরা বায়তুল্লার তোয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছি। আঁ হযরত (সাঃ) এ বিষয়ে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন এই আপত্তি অহেতুক। ভেবে দেখ যে ওই কুরায়েশ যারা প্রতি মুহূর্ত মুসলমানদের রক্তের পিপাসু ছিল। তাদের অস্তিত্ব বিলীন করতে উদগ্রীব ছিল। তারা নিজেরাই এই চুক্তি করল যে, তারা দশ বছর মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকবে। এবং কোন যুদ্ধ করবে না। কুফ্ফার মক্কা মুসলমানদের অস্তিত্ব ও মূল্যকে স্বীকার করে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করতে সম্মত হল। যার জন্য আমরা প্রারম্ভিক ইসলাম থেকেই প্রচেষ্টায় ছিলাম। আমরা শান্তি ও সৌহার্দ্যের সহিত মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে সুরক্ষিত থেকে ইসলাম প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারি।

শ্রোতাবর্গ! ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি একথা প্রমাণ করে যে, আঁ হযরত (সাঃ) যা বলেছিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পূর্ণ হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে পর্যন্ত মুসলমান ও কুফ্ফাররা একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও করত না। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণে পারস্পরিক কথা বার্তা ও যাতায়াত আরম্ভ হয়। কুফ্ফার মক্কা বাণিজ্যের উদ্দ্যেশ্যে মদিনা আসা শুরু করল। এবং তারা মদিনায় মাসের পর মাস অবস্থান করত। মুসলমানদের ইবাদত, আচরণ ও চারিত্রিক সৌন্দর্য তারা প্রত্যক্ষ করত। ইসলাম প্রসঙ্গ ব্যবসায়িক বিষয়াদি ও যুক্তিতর্কের মাঝে চলে আসত। আর তারা এটা চিন্তা করতে বাধ্য হত যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই কুরায়েশরা যারা হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছে তারা তো আমাদের মতই পাপাচারে নিমগ্ন ছিল। এখন এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের পেছনে কোন্ জিনিস কাজ করছে? এর একটাই উত্তর বোধগম্য হয় এবং সেটা ছিল ইসলাম গ্রহণ। সুতরাং তাদের মধ্যে অধিকাংশ আঁ হযরত (সাঃ) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে ফিরে যেত। হযরত খালেদ বিন ওলিদ এবং হযরত উমর বিন আস এই সময়ের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন ও তাদের ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়। এবং পরবর্তীতে এই দুজন বুজুর্গ সিরিয়া ও মিশরের বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হুদাইবিয়ার স্থানে নির্ধারিত ও গৃহীত চুক্তি অনুসারে আগামী বছর জুল কাদা ৭ হিজরী মার্চ ৬২৯ সালে আঁ হযরত (সাঃ) কুরবানী প্রদানসহ উমরা পালন করেন। এবং কুরআন করীমের আয়াত অতিব মর্যাদার সহিত পূর্ণতা লাভ করে।অর্থাৎ " নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্নটি যথাযথ ভাবে দেখালেন। আল্লাহ চাইলে তোমরা তোমাদের মাথা কামানো ও চুল ছাঁটানো অবস্থায় অবশ্যই নিরাপদে (ও) নির্ভয়ে 'মসজিদুল হারামে' প্রবেশ করবে"।

(সূরা ফাতাহ্, আয়াত-২৮)

কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ সাহেবের একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষন অনুযায়ী ১৩ বছরের মক্কার জীবনের প্রায় ৬ বছর পর্যন্ত মদিনায় জীবনের মোট ১৯ বছর সময়ে ইসলাম মাত্র ১৪০০ মুসলমান তৈরী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই সময় যা হুদাইবিয়া সন্ধি ৬ হিজরি থেকে মক্কা বিজয় ৮ হিজরী পর্যন্ত এই দুবছরের শান্তিপূর্ণ প্রচারে এই সংখ্যায় আরও ৮৬০০ জন মুসলমান বৃদ্ধি পায়। এতে মহিলা ও বাচ্চাদের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নেই। এই আশ্চর্য্যজনক পার্থক্য এরূপে সৃষ্টি হল যে, যুদ্ধের যুগে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের খুব কম সুযোগ ছিল এই কারণে তারা ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষাকে শোনার সুযোগ পেত না। কিন্তু সন্ধি ও শান্তির যুগে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বিসর্জন করে যখন তারা ইসলামী শিক্ষাকে শুনল ও দেখল ইসলামের তারাও ইসলামের অনুরাগী হতে লাগল এবং ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগল।

শ্রোতাবৃন্দ! ঐতিহাসিক সত্যতা বলে দিচ্ছে যে, ইসলামকে শান্তি ও সৌন্দর্যের যুগে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছে। সুতরাং এই প্রকৃত ঘটনাবলী ঘোষণা দিচ্ছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র ভালবাসার পরিবেশে প্রসারলাভ কারী ধর্ম। শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবর্গ! ইসলামের প্রারম্ভিক তিন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতা এবং অন্ধকারময় এক হাজার বৎসর পর কুরআন মজীদের সূরা জুম'আ তে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আঁ হযরত (সাঃ) এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিকাশস্থল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী (আঃ) মসীহ্ ও মাহদী (আঃ) এর দ্বারা দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের জন্য চুক্তির এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগ আঁ হযরত (সাঃ) এর সৌন্দর্য বিকাশক যুগ সুতরাং হযরত মসীহ (আঃ) বলেনঃ– "সুতরাং আমার আবির্ভাবের পর তরবারির কোন জেহাদ নাই। আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও চুক্তির ধ্বজা উত্তোলিত হয়েছে। তাই প্রতিশ্রুত মসীহ তার সৈন্যদলকে এই নিষিদ্ধ স্থান থেকে সরে যাওয়ায় নির্দেশ দিচ্ছে, যে মন্দের প্রত্যুত্তর মন্দের দ্বারা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নিজেকে দুষ্টের আক্রমণ থেকে প্রতিহত কর। কিন্তু নিজে দুষ্টের মোকাবিলা কোরো না।"

(খুতবা এলহামিয়া)

চুক্তির এই ঘোষণার পর আহ্মদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম দ্রুততার সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করতে থাকে। আর যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) জলসা সালানা ২০১৩ সময় ঘোষণা করেন যে, ২০৪ টি দেশে এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ তায়ালা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি শীঘ্র অতিব মর্যাদার সহিত পূর্ণ হবে।" এবং সিলসিলা দ্রুততার সহিত বর্দ্ধিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে। এমনকি জগৎ কে পরিবেষ্টন করবে। অনেক বাধাবিপত্তি ও দুর্যোগ আসবে। খোদা তা'লা সমস্ত কিছু মাঝখান থেকে অপসরণ করবেন এবং তাঁর স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। (তাজললিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ-১৬, রুহানি খাজায়েন, জিলদ ২০ পৃঃ-৪০৯)আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে আদেশ করেছেন 'আল্লাহ তায়ালা লোকেদের উপর বিধিবদ্ধ করেছেন যে তারা এই ঘরে অর্থাৎ খানা কাবায়হজ্ব করুক, যে কেউ সেখানে পৌছাবার সৌভাগ্য অর্জন করে।' অর্থাৎ হজ্ব সেই মুসলমানের জন্য পালনীয়, যে আর্থিক দিক দিয়ে সফর করার সামর্থ্য রাখে। যেরূপ ভাবে যাকাত নিসাবের অন্তর্ভুক্ত এর উপর বিধিবদ্ধ যে নিসাবের বাইরে তার জন্য যাকাত ফরজ নয়। অনুরূপ ভাবে হজ্ব সামর্থ্যবান লোকেদের জন্য পালনীয়। অন্যান্যদের জন্য নয়। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জামাত আহমদীয়ার ভিত্তি প্রস্তর রাখেন,প্রত্যেক বছর সামর্থ্যবান সদস্যরা হজ্ব পালন করার জন্য মক্কা মুকার্‌রমা যেতেন।

হযরত মসীহ (আঃ) পথের দুর্গমতা সত্বেও হজ্বের জন্য সংকল্প করেছিলেন। সুতরাং হযরত উম্মুল মুমেনীন নুসরাত জাঁহা বেগম সাহেবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে দিন গুলিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হজ্ব করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব করিয়েছি। হযরত সাহেবজাদা মির্জা বশির আহমদ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 13 Dec, 2018 Issue No. 50

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১০ পাতার পর.....

সাহেব এম.এ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার মাতা হযরত হাফেজ আহ্মাদুল্লাহ্ সাহেব মরহুম কে পাঠিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পক্ষ থেকে হজ্ব বিনিময় করিয়েছেন। এবং সমস্ত খরচ আমার মাতা নিজে বহন করেছিলেন।

(সিরাতুল মাহদী পৃঃ-৪৫ রোওয়াত নং ৫৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল মওলানা নুরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) ১৮৬৫ তে হজ্বের কর্তব্য পালন করার জন্য যান এবং ১৯১৩ সালে জিদ্দা থেকে মক্কা মুকার্‌রমায় যাবার পথে একটি নজম রচনা করেন যার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ হল।

এ ছিল মোর বাসনা দেখিব এই পবিত্র ভূমি, যেথায় নাজিল হল তোমার কিতাব জননী। উদয়ে আখ্যা মোর পিতাকে, ডেকেছে ইব্রাহিম নামে। মরিয়ম পুত্র আমি তবু তৃষ্ণার্ত আমি যাই মক্কার আশা পূর্ণ হবে নসীব হবে পানি।

(তারিখ আহ্মদীয়াত, খন্ড-৩, পৃঃ-৪১৭)

সৈয়্যদনা মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কুরবানী সহ হজ্ব পালন করেন এবং ফিরে আসেন। তাৎপর্য এই যে, জামাত আহমদীয়ার সামর্থ্যবান সদস্যরা প্রতি বছর বায়তুল্লাহর হজ্বের জন্য যান কিন্তু কিছু কাল যাবৎ কিছু দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন জামাতের সদস্যদের বায়তুল্লাহর হজ্বে যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। জানি না তাদেরকে কে এই অধিকার দিয়েছে। যাই হোক আমরা জামাত আহমদীয়াকে হজ্ব ও উমরা থেকে বাধাদান কারীদের হুদাইবিয়ার চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সাবধান করতে চাই যে, ঐ বছর মক্কায় কুফ্ফারদের পরিণতির কথা দৃষ্টি পটে রাখুন, যারা হুদাইবিয়ায় সৈয়্যদনা মহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের মক্কা মুকর্‌রমা তে যাবার পথে বাধা দিয়েছিল আল্লাহ তা'লা তাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিয়েছেন। এবং যাদেরকে বাধা দেওয়া হল আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সম্মানীয় কাবার চাবি প্রদান করলেন। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর যুগে একজন সাহাবী হজ্বে সম্মুখীন হওয়ার অসুবিধা উল্লেখ করলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :-

"আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। যেন এমন হয় যে, ঐ সমস্ত কষ্টের ঘটনাবলী দ্বারা আপনার ঈমানী শক্তিতে কোন প্রকারের পার্থক্য ও আলোড়ন না আসে। এটা খোদাতা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা, এর দ্বারা পবিত্র বিশ্বাসের উপর প্রভাব না পড়ে। এই বিষয়গুলির কারণে ঐ বরকতমন্ডিত স্থানের মহত্ব অন্তর থেকে কমে না যায়। কেননা এর চাইতে এক নিকৃষ্ট যুগ অতিক্রম হয়েছে। এই পবিত্র স্থানই অপবিত্র মুশরিকদের দখলে ছিল। এবং তারা সেটিকে মূর্তির ঘর বানিয়ে রেখেছিল। এবং এই সমস্থ প্রতিকুলতা ও দুর্যোগ সুখময় ভবিষ্যত ও জীবনের সোপান পর্যায়। লক্ষ্য কর আঁ হযরত (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বেও যুগের পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। এবং কুফর, শিরক, কলহ ও নোংরামি সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। তবুও সেই অন্ধকারের পরেও এক জ্যোতি জগতে প্রকাশ পেয়েছিল। অনুরূপ ভাবে এখনও প্রত্যাশা করা উচিৎ যে, আল্লাহতা'লা এই সকল অসুবিধার পর কোন উন্নতির উপকরণও করে দিবেন। বরং এই বরকতমন্ডিত ও পবিত্র স্থানে আরও একটি এমনি ভয়ঙ্কর ও স্পর্শকাতর সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল যার প্রতি আল্লাহতা'লা আঁ হযরত (সাঃ) এর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ "তুমি কি জান না তোমার প্রভু প্রতিপালক হস্তী বাহিনীর সাথে কি রকম আচরণ করেছিলেন"।

(সূরা ফিল, আয়াত -২)

এটা তৃতীয় ঘটনা । এর প্রতিও আল্লাহতালা আবশ্যই মনোযোগ দিবেন। আর খোদা তায়ালার মনোযোগ দেওয়া তো ভয়ঙ্কর রূপেই হবে।"

(মলফুজাত, জিলদ ৯,পৃঃ-৪৩৫)

বাধাসৃষ্টিকারীরা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে কুফফার মক্কার ন্যায় শক্ত বাধা তৈরী করুন। জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের হৃদয়ে এই বরকত মন্ডিত স্থানের প্রতি ভালবাসা কখনো কম হবে না। এবং প্রত্যেক আহমদী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর এই পংক্তিটির মাধ্যমে এই দোয়া করতে থাকবে।

রাবওয়া কাবার উচ্চ মর্যাদার জন্য দোওয়ারত থাকুক। কাবার প্রতি রাবওয়ার দোয়া পৌঁছাতে থাকুক। এই দোয়া করি যে, পৃথিবীর সমস্ত আহমদী পরিবার যেন রাবওয়ার অনুরুপ হয়ে গিয়ে কাবার উচ্চ মর্যাদা এবং জাতির জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকে। এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) খানা কাবায় নিজের জাতির জন্য দোয়া করেছে তাঁর কল্যাণ প্রত্যেক আহমদী পরিবার যেন পেতে থাকে।

## 27- اَلصَّبْرُ رِضًا

( ধৈর্য হল আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকার অপর নাম)

যখন কোন কিছুই আর হয়ে উঠছে না তখন মুখে কেবল ধৈর্য ধারণ করার কথা বললাম অথচ হৃদয় খোদার তকদীরে অসন্তুষ্ট রয়েছে-এটি ধৈর্য নয়। -হাদীস

যাহারা তরবারির আঘাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য ঐ সমস্ত লোক যাহারা কতল বা ঐরূপ অপরাধে অপরাধী ছিল, তাহারা সকলেই খোদাতালার দৃষ্টিতে হত্যার শাস্তি-স্বরূপ নিহত হওয়ার যোগ্য ছিল । কিন্তু পরম করুণায় খোদাতালার পক্ষ হইতে এই আকাশ দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ মুসলমান হইয়া যায়, তাহা হইলে অতীতের যে অপরাধের ফলে সে মৃত্যুদন্ড লাভের উপযোগী ছিল, তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে । অতএব কোথায় এই দয়ার মহিমা আর কোথায় বলপ্রয়োগ"?

টিকা ২: আল্ মিনারের সম্পাদকের ন্যায় কোন কোন অজ্ঞ লোক আমার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকে যে, 'এই ব্যক্তি ইংরেজ রাজ্যে বাস করে বলিয়া জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) নিষেধ করে ।' এই মুর্খেরা কি এ কথা বুঝে না যে, আমি যদি মিথ্যা কথা দআবার এই গভর্নমেন্টকে খুশী করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে কেন বারবার আমি এ কথা বলিতাম যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) ক্রুশ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাভাবিকভাবে (কাশ্মীরের অন্তর্গত) শ্রী নগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন? তিনি খোদাও ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না । ধর্মপ্রাণ ইংরেজগণ কি আমার এই উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইবেন না? অতএব হে অজ্ঞ ব্রক্তিগণ! শুনিয়া রাখ, আমি এই গভর্নমেন্টের কোন তোষামোদ করি না; বরং প্রকৃত কথা এই যে, যে গভর্নমেন্ট ইসলাম ধর্মে এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না এবং স্বধর্মের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রতি তরবারি চালায় না, এরূপ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করা কুরআন শরীফের শিক্ষানুসারে নিষিদ্ধ; কেননা তাহারাও কোন ধর্মযুদ্ধ করে না । তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের এই জন্য কর্তব্য যে, আমরা আমাদের কর্মে মক্কা এবং মদীনায়ও করিতে পারিতাম না । কিন্তু তাহাদের রাজ্যে তাহা করিতে পারিতেছি, খোদাতালার পক্ষ হইতে ইহা এক হিকমত (গভীর প্রজ্ঞা) ছিল যে, আমাকে তিনি এই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব আমি কি খোদার হিকমতের অমর্যাদা করিব? যেমন কুরআন শরীফের وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এই আয়াতে (২৩ঃ৫১) আল্লাহতালা আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, 'ক্রুশের ঘটনার পর আমি ঈসা মসীহকে ক্রুশের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে এইরূপ এক উচ্চ মালভূমির উপর স্থান দিয়াছিলাম যাহা আরামদায়ক ছিল এবং যাহাতে ঝরণা প্রবাহিত হইতেছিল'- অর্থাৎ কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরে! তদ্রুপ খোদাতালা আমাকে এই গভর্নমেন্টরূপে উচ্চ মালভূমিতে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে শত্রুর হস্ত পৌঁছিতে পারে না, যেস্থান আরামদায়ক ।

এই দেশে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হইতেছে এবং উপদ্রবকারীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। অতএব এরূপ গভর্নমেন্টের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি আমাদের কর্তব্য ছিল না?

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২২, পৃ: ৭১-৭৩)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir